ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ।। ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৩ নভেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি

স্বীকার করলেন স্বয়ং মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিরোধীদের বহু পুরনো অভিযোগের সত্যতা শেষপর্যন্ত স্বীকার করেই নিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী আনিসুর রহমান। গত ১১ই নভেম্বর বিধানসভায় অধ্যক্ষ হাসিম আব্দুল হালিমের উপস্থিতিতে এক সর্বদলীয় কর্মশালায়

আনিসুর রহমান

পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন—''রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটা অনবরত দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং রাজনৈতিকভাবে নাক গলানোর জন্যই বিপর্যস্ত হয়েছে।''

যেদিন আনিসুর এই কথাগুলি বলেন তার আগের দিনেই দশটি বিধানসভার উপনির্বানের ফলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় সিপিএম। সম্ভবত সেই ফলাফলের কথা মাথায় রেখেই আনিসুর রহমান বলেন—রাজ্য সরকার একাধিকবার কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাঁরা যেন দরকার হলে আইন পরিবর্তন করে পঞ্চায়েতে শাসকপক্ষের একচেটিয়া অধিকারকে খর্ব করেন। এবং শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও যেন বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বক্তব্য—''পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও স্বচ্ছ করে তোলার লক্ষ্যেই এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।''

আনিসুর রহমান স্পষ্টই স্বীকার করে নিয়েছেন, দুর্নীতি আরও গভীরে শিকড় গাড়ছে এবং পুরো গ্রামীণ প্রশাসনটাই ধীরে ধীরে দলীয় রাজনীতির কবলে চলে যাওয়ার দরুণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটাই একপ্রকার ভেঙ্গে পড়েছে। দৃশ্যতই হতাশ আনিসুর একপ্রকার সাহায্যভিক্ষাই চেয়েছেন বিরোধীদের কাছ থেকে। তাঁর বক্তব্য—''বর্তমান আইন অনুযায়ী, শাসক দলের এম পি এবং এম এল এ-রা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির এক্স অফিসিও-সদস্য। এটা কিন্তু শাসক দলের সর্বময় কর্তৃত্বকেই প্রতিফলিত করে। আমরা মনে করছি এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। কেন্দ্রকেও বলেছি তাঁরা যেন এই আইন পরিবর্তন করে এমন আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন, যাতে বিরোধীরাও কথা বলার সুযোগ পান।'' একই সঙ্গে তিনি পঞ্চায়েতের কাজকর্মে শিক্ষিত, কম্পিউটার জানা ছেলেমেয়েদেরও আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার কথা বলেন।

আনিসুর রহমান জোর দিয়েছেন,—''পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন। এই কাজে যারা যুক্ত আছেন তাঁরা যদি ঠিকঠাক মতো কাজ না করে খালি ফাঁকি দেন তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেই গণ্য হবে।''

আনিসুর রহমানের এই 'আত্মসমালোচনা'-কে বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ''তাঁদের সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটতে অনেক দেরী হয়ে গেল।'' স্পষ্টতই তাঁর ইঙ্গিত প্রাক্তন (এরপর ৪ পাতায়)

দেশের অখণ্ডতা নিয়ে আপস নয় : শ্রীভাগবত

প্রশ্ন ঃ 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে দেওবন্দের প্রতিক্রিয়াকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

মোহনজী ঃ বন্দেমাতরম্ প্রত্যেক ভারতীয়-র জন্য। এটা আমাদের জাতীয় আন্দোলন ও ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটা সময় ছিল যখন হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে এটা গাইতেন।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা বলছে যে এটা তাদের ধর্মবিরোধী।

মোহনজী ঃ আমি মনে করি না কোনও ধর্মই দেশপ্রেমের বিরোধী হতে পারে বলে। 'ভারতমাতা কী জয়' বা 'বন্দেমাতরম্' বলা মানে কোন ধর্মের উপাসনা বা মূর্তিপুজো নয়।

প্রশ্ন ঃ এব্যাপারে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গীটা ঠিক কি?

মোহনজী ঃ (টেবিল চাপড়ে) প্রত্যেক ভারতবাসীকে বন্দেমাতরম্ বলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি এটা মনে করছেন যে মসজিদ ভাঙার পর থেকে সংখ্যালঘুরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন?

(এরপর ১৬ পাতায়)

আলিমুদ্দিনকে পাত্তা দিচ্ছে না কমরেডরা

গুঢ়পুরুষ।। সেই ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে সাম্প্রতিক বিধানসভার উপনির্বাচনে সি পি এমের প্রার্থীদের টানা পরাজয় আক্ষরিক অর্থেই কমরেডদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। মার্কসবাদের কোন টোটকা বা টনিক এখন আর কাজে লাগছে না। তাই বিপন্ন বিমান বসু বাধ্য হয়েছেন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরির দ্বারস্থ হতে। বিমানবাবু তাঁদের জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলার কমরেডরা আলিমুদ্দিনের নির্দেশ মানছেন না। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে ২০১১ সালে বিধানসভার নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত। বিমানবাবুর বার্তা পাওয়ার পর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তিন মহারথী প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি এবং এস. আর পিল্লাই সরেজমিন তদন্তের জন্য ২৯ নভেম্বর কলকাতায় দলের রাজ্য-কমিটির দু'দিনের বৈঠকে যোগ দেবেন। এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়, পার্টির কমরেডদের সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ কীভাবে দলকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পার্টির হোলটাইমারদের

> ‘‘বিমানবাবু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যের ১০টি জেলায় দলীয় সংগঠনে ধস নেমেছে। এর প্রধান কারণ, পার্টির কমরেডদের আর্থিক দুর্নীতি। স্থানীয় সমাজবিরোধীদের কাজে লাগিয়ে পার্টির নামে তোলাবাজি, সন্ত্রাস আর দলের ভিতরে গোষ্ঠি কোন্দল। আদতে যা বখরার লড়াই।’’

এমন বিপুল অর্থ সম্পত্তির সূত্রটাই বা কী তা খোঁজারও চেষ্টা হবে বৈঠকে।

বিমানবাবু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে রাজ্যের ১০টি জেলায়—পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির চা বাগান এলাকায় দলীয় সংগঠনে ধস নেমেছে। এর প্রধান কারণ, পার্টির কমরেডদের আর্থিক দুর্নীতি। স্থানীয় সমাজবিরোধীদের কাজে লাগিয়ে পার্টির নামে তোলাবাজি, সন্ত্রাস আর দলের ভিতরে গোষ্ঠি কোন্দল। আদতে যা বখরার লড়াই। জেলার নেতারা আলিমুদ্দিনের নির্দেশ মেনে চলেন না। দুর্নীতি এবং দলীয় শৃঙ্খলাহীনতাই নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থীদের পরাজয় নিশ্চিত করেছে। বিমানবাবু তাঁর রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলেছেন—পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, আগামী বিধানসভার নির্বাচনের আগে দুর্নীতিপরায়ণ জেলার নেতাদের দল থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

কিন্তু তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলাটা যত সহজ বাস্তবে তা নয়। কে কাদের তাড়াবে? পার্টির ৯৯ শতাংশ কমরেড কমবেশি আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত। অধিকাংশই জমি মাফিয়াদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় তিনজন প্রভাবশালী সি পি এম নেতা জমি মাফিয়াদের কাছ থেকে কাঠা প্রতি জমির জন্য মোটা অঙ্কের সেলামি নেন বলে (এরপর ৪ পাতায়)

বনাঞ্চল থেকে বাংলাদেশী বিতাড়নের দাবী জানাল জনজাতি সুরক্ষা সমিতি

হরিসাধন কোনার ঃ শিলচর।। বনাঞ্চল থেকে 'অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হঠাও', 'গিরিবাসী শহরবাসী আমরা সবাই ভারতবাসী', 'সবার মাতা, ভারতমাতা'—প্রভৃতি স্লোগানে হাজার কয়েক জনজাতি আবালবৃদ্ধ-বনিতা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে। মুহুর্মুহু শ্লোগান, হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে সুদীর্ঘ মিছিল। মিছিলের দাবী ও অঙ্গীকার বনাঞ্চলে থাকার অধিকার বনবাসীদেরই। বনাঞ্চলের এক ইঞ্চি জমিও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাতে দেওয়া হবে না। এভাবেই ব্যতিক্রমী নজরকাড়া মিছিল ও সমাবেশ করল বরাক ভ্যালি জনজাতি সুরক্ষা সমিতি বা ট্রাইব্যাল প্রোটেকশন ফোরাম। মিছিল ও শোভাযাত্রার আগে ইন্ডিয়া ক্লাব ময়দানে সকলে জমায়েত হন।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে অসমের বনাঞ্চলে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা স্থায়ী-বসতি স্থাপন করছে রাজনৈতিক মদতে। এমনকী সংরক্ষিত কাজিরাঙা বনাঞ্চলেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ঘাঁটি গেড়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ।

প্রখর রোদের তাপ উপেক্ষা করে জনজাতিরা দলে দলে ক্লাব ময়দানে একত্রিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বক্তা দাবীর সপক্ষে বক্তব্য রাখেন একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায়। তবে মূল বক্তা ছিলেন এন ডি এ আমলে কেন্দ্র সরকারের তপশীলি জাতি ও উপজাতি কমিশনের চেয়ারম্যান (প্রাক্তন) দিলীপ সিং ভুরিয়া। শ্রীভুরিয়া বলেন— ট্রাইব্যাল ও টাইগার একত্রে বনে বাস করে। দেশের প্রায়

দিলীপ সিং ভুরিয়া

৯ কোটি বনবাসী, গিরিবাসী জনজাতিদের বঞ্চিত করলে তার ফল হবে মারাত্মক। সেক্ষেত্রে দিল্লী ও দিসপুরের মসনদ টলমল করবে। তিনি আরও বলেন, সারা দেশে সর্বত্রই জল, জমি ও জঙ্গলে বনবাসীদের স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। কোনও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে অন্যদেরকে সেখানে জাঁকিয়ে বসতে দেওয়া যাবে না। জনজাতি—বনবাসী, গিরিবাসীরা একজোট হলেই সেখানে অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা বনাঞ্চলে ঘাঁটি গাড়তে পারবে না। এজন্য তিনি তাবৎ বনবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে, সুন্দর, সুস্থ চিন্তা-ভাবনায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। ভুরিয়ার কথায়, সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-কারীদের বনাঞ্চল থেকে উৎখাত করতে না পারলে বনবাসী জনজাতিরা একজোট হয়ে সে কাজ করতে সক্ষম।

বনবাসীদের প্রতি সরকারি স্তরে বঞ্চনার বিষয়ে সরব হন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং জনজাতি নেতা শোণিত বর্মন, ট্রাইব্যাল প্রোটেকশন ফোরামের পক্ষে রবীন্দ্র বর্মন, জনজাতি কৃষ্টি সুরক্ষা সমিতির সর্বভারতীয় নেতা জলেশ্বর ব্রহ্ম, স্থানীয় নেতা কাদুল রংমাই প্রমুখ। সভার পর ইন্ডিয়া ক্লাব থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল জেল রোড, প্রেমতলা, শিলংপট্টি, জানীগঞ্জ, ক্লাব রোড হয়ে আবার ক্লাব ময়দানে শেষ হয়। জেলাশাসকের মাধ্যমে অসমের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি তুলে দেন জনজাতি নেতৃবৃন্দ।

বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিলীপ সিং ভুরিয়া জনজাতিদের উপর বাংলাদেশীদের অত্যাচার, নৃশংসতা ও জোর করে জমি দখলের বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। ধলাই থানা এলাকার কালাহাওর বনাঞ্চলে স্থানীয় সমাজবিরোধীদের সহযোগিতায় বাংলাদেশীরা জনজাতিদের জমি দখল করছে বলে অভিযোগ করা হয়। ২০০৫ সালেই এ ব্যাপারে 'কালাহাওর ট্রাইব্যাল উইমেন এসোসিয়েশন' কেন্দ্রীয় তপশিলী জাতি ও জনজাতি কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেও কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়। এবিষয়ে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গ এদিনের শিলচরের কর্মসূচী। স্মারকলিপির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে—দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রক, ডোনার মন্ত্রক (ডেভেলপমেন্ট অফ দি নর্থ ইস্ট রিজিয়ন)। মুখ্যমন্ত্রী থেকে ধলাই, বড়খলা, কাটিগড়া ও উধারবন্দের বিধায়কদেরও। জনজাতি নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, বাংলাদেশীরা গত ২৫ বছর যাবৎ অবাধে মূল্যবান গাছ-গাছড়া কেটে পাচার করছে। শ্রীভুরিয়া বলেন, স্বাধীনতার ৬২ বছর পরও দেশের প্রাচীন অধিবাসী ভূমিপুত্র জন-জাতিরা আধুনিক জীবনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মাওবাদী হামলার আশঙ্কা সত্ত্বেও রাতের মহাকরণে অবাঞ্ছিত অতিথিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দিনের বেলায় কর্মময়, আঁটোসাটো নিরাপত্তাবলয়ে ঢেকে থাকা রাজ্য প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স বিল্ডিং (মহাকরণ) রাত নামলে কি রূপ ধারণ করে? গভীর রাতের মহাকরণের রূপ দেখতেই কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের একটি সমীক্ষক দল গত ৫ই নভেম্বর রাত নামলে গিয়েছিলেন সেখানে। তারপর যা দেখলেন তাতে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। দেখলেন— দিনের বেলায় মন্ত্রী এবং আমলারা যে চত্বরে বসে কাজকর্ম করেন, রাতের বেলায় সেই এলাকার পুরোটাই দখলে চলে গিয়েছে পূর্ত দফতরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ও তাদের পরিবার পরিজনদের হাতে। মাওবাদী হামলা থেকে জঙ্গি নাশকতা—যাবতীয় দুর্ঘটনার সম্ভাব্য অনুঘটকের এই উপস্থিতি আতঙ্কে বিহ্বল করে দিয়েছিল উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের।

পুলিশ আধিকারিকদের ওই সমীক্ষক দলের দায়িত্বে থাকা ডি সি রিজার্ভ ফোর্স— বাসব দাশগুপ্ত কলকাতার নগরপাল গৌতমমোহন চক্রবর্তীর কাছে জমা দেওয়া সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলেছেন—রাতের বেলায় যাঁরা মহাকরণে থাকেন, তাদের অধিকাংশরই বৈধ অনুপতিপত্র নেই । এঁদের অধিকাংশই পূর্তদফতের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের আত্মীয় পরিজন। এঁরা মূলত গ্রাম থেকে আসেন এবং ডাক্তার দেখাবার জন্যে কয়েকটা রাত মহাকরণেই কাটিয়ে যান। কিন্তু এর মধ্যে বহু সন্দেহভাজন ব্যক্তিই লুকিয়ে থাকতে পারে বলে ওই সমীক্ষক দলের আশঙ্কা।

ওই সমীক্ষক দলের এবং আধিকারিকদের বক্তব্য—"পূর্ত বিভাগের

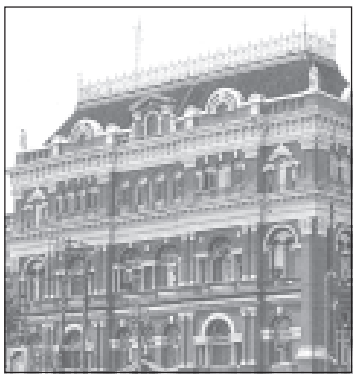

কর্মীদের আত্মীয় পরিজনদের রাতে মহাকরণে থাকা সম্পূর্ণ বে-আইনী। এটা ঠিকই যে, তাঁরা হয়তো ডাক্তার দেখাতেই এখানে আসেন কিন্তু মহাকরণে থাকতে পারবেন না।" প্রসঙ্গত, পূর্তবিভাগের ৬১ জন কর্মীর এখানে থাকবার অনুমতি রয়েছে যারা বিভিন্ন জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যাই হোক, যারা শিফটে কাজ করেন এমন ১১০ জন পূর্ত বিভাগের কর্মীরাও নাইট শিফটে থাকতে পারেন মহাকরণে।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব অর্ধেন্দু সেনকে দেওয়া ওই সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদিও রাতে মহাকরণে থাকবার জন্য অনুমতিপত্র দেওয়া হয় কিন্তু তারা ছাড়াও যে বাইরের অনেক লোক ওখানে থাকছেন তাদের পাকড়াও করা প্রয়োজন।

আপাতত যেটা ঠিক হয়েছে যে, অন্যান্য ভিজিটরসদের থেকে ভি আই পিদের প্রবেশ ও প্রস্থান পথ আলাদা করা হবে। কারণ মাওবাদীরা তাদের শক্তি প্রদর্শন করার জন্যে অতর্কিতে হানা দিতে পারে মহাকরণে। এমনকী মহাকরণের দেওয়ালে মাওবাদী হুমকি সম্বলিত পোস্টারও চোখে পড়েছে সম্প্রতি। ইতিমধ্যে তিনজন হুজি জঙ্গি ৩০ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধর্মতলায় ধরা পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সমীক্ষায় যা ধরা পড়েছে তাতে সরকারের রীতিমতো তড়িতাহতের মতো দশা। পূর্ত দফতর বলছে, মহাকরণে রাতে লোক রাখার ক্ষেত্রে এবার থেকে তারা সতর্ক হবে। সেই কারণে সরকারের পূর্ত বিভাগ, কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর শীঘ্রই বৈঠকে বসবে মহাকরণে, রাতে থাকার ক্ষেত্রে কড়া নিয়মাবলী চালু করতে এবং তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য পথ বাতলাতে।

এই সময়

মধুচন্দ্রিমা শেষ

সময়ের ব্যবধান মাত্র দশ মাসের। এরই মধ্যে মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়ে গেল উত্তরপ্রদেশ রাজ্য রাজনীতির দুই তারকা মুলায়ম সিং যাদব ও কল্যাণ সিং-এর। এ বছরের গোড়াতে কল্যাণ ন্যাশানাল টেলিভিশনে মুলায়মের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন। গত ১৪ই নভেম্বর সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতা' এবং 'সুযোগ-সন্ধানে'র অভিযোগ হানেন। কল্যাণ আরও বলেন—"আর এস এসের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। হিন্দুত্বের পথেই ফিরে যাব।" তিনি বিজেপি ছাড়ায় সংগঠনের যে ক্ষতি হয়েছিল তা নিয়ে তাঁর অনুশোচনার অন্ত নেই—এমনটাই বলছেন কল্যাণ।

লঙ্কা-সন্দেশ

এল টি টি ই-কে শেষ করার যাবতীয় কৃতিত্বের দায়ভার প্রেসিডেন্ট রাজপক্ষে এবং সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ জেনারেল ফনেস্কার কাঁধেই বর্তেছে। আপাতত তাঁরাই পরস্পর যুযুধান হতে পারেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই জেনারেলের সর্বোচ্চ পদ থেকে ইস্তফাও দিয়েছেন ফনেস্কা। এদিকে গত ১৫ই নভেম্বর রাজপক্ষের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিলিত হন ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তামিল উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তাও হয়। অন্যদিকে ফনেস্কা ভারতকে এব্যাপারে মধ্যস্থতা না করার জন্যে সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খেল জমেছে ভালই! তামিলরাই খালি উপেক্ষিত হচ্ছে।

টালবাহানা অব্যাহত

জলবায়ুর পরিবর্তন, আরও ভাল করে বললে বিশ্ব উষ্ণায়ণ নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্বের সবকয়টি রাষ্ট্র। কিন্তু এনিয়ে লাগাম পরানোর কাজটা আর হয়ে উঠছে না কিছুতেই। সম্প্রতি এই টালবাহানাকে একপ্রকার সমর্থনই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও জি-৮-এর রাষ্ট্রপ্রধানরা। তাঁরা আপাতত তাকিয়ে রয়েছেন আগামী মাসের কোপেনহেগেন শিখর সম্মেলনের দিকে। টাইম ফ্যাক্টর ও একক দেশগুলির দিকে তাকিয়ে ২০১০ বা তারও বেশী সময়ের জন্য জলবায়ু চুক্তি (Climate Pact) কোপেনহেগেনেই সম্পন্ন হতে পারে বলে আন্তর্জাতিক মহলের অনুমান। ততদিনে গরম না হয় আরও একটু বাড়লই।

মুদ্রাস্ফীতির খেল

শত চেষ্টা করেও, হাজারো পি সি সরকারের খেল দেখিয়েও আর মাইনাসে আটকে রাখা গেল না মুদ্রাস্ফীতিকে। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে গত মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৪ শতাংশ-এ। তার আগের মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ একমাসে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ধারণা, কোনও বড়সড় অঘটন না ঘটলে আগামী বছর মার্চের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ৬.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এই নভেম্বরের মাঝামাঝিতেও মুদ্রাস্ফীতির ক্রমাগত বর্ধিষ্ণু সূচক সেই অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। আশ্চর্য হ'ল এ বছরে এখনও পর্যন্ত ৬.১৩ শতাংশ হারে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে; গত বছরে যা ছিল ৫.৯৯ শতাংশ।

আসরে মার্কিন গোয়েন্দা

এই খবরটি যখন প্রকাশিত হবে তখন ভারতে এসে যাবেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ প্রধান লিওন পানেট্টা। ভারতে তাঁর আসার দিনটি হলো ২০শে নভেম্বর, শুক্রবার। মূলত এদেশের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, এবং সি আই এ-র কাউন্টার টেররিজম স্কোয়াডে ভারতীয় গোয়েন্দা-বাহিনী 'র'-এর যোগদানের ব্যাপারে আলোচনা করতেই তিন দিনের সফরে এদেশে আসছেন পানেট্টা। সেইসঙ্গে হ্যাডলি থেকে শুরু করে লস্কর-এ-তৈবার আক্রমণ ঠেকানোর ব্যাপারও কথা বলবেন সি আই এ প্রধান।

৩২ বছর বাদে

মরার আগে হরিনাম করতে গিয়ে অর্থাৎ ৩২টা বছর দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে এখন মহাকরণ থেকে ঘাড়ধাক্কা খাবার আগে শিল্পায়নের জোয়ার আনতে চাইছে বাম সরকার। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের পর এবার সরকারের দৃষ্টি পড়েছে বর্ধমানের পানাগড়ের দিকে। লক্ষ্য— পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। সেই পার্ক তৈরির জন্যে এসার গ্রুপকে প্রায় বিনামূল্যে বর্তমান বাজারে ৪০০০ কোটি টাকার আর্থিক মূল্য সম্পন্ন একটি উর্বর জমি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আগামী সপ্তাহেই এনিয়ে রাজ্য সরকার ও এসার গ্রুপের 'মৌ' সাক্ষরিত হবে। জানা গিয়েছে এসার গ্রুপ ম্যাটিক্স কোম্পানীর নাম দিয়ে ওখানে মেগা ফার্টিলাইজার ইউনিট গড়ে তুলবে যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১.২ মিলিয়ান টন। এনিয়ে বিরোধী দলের বিক্ষোভের কোনও খবর সেখানে এখনও অবধি নেই।

নয়া টোটকা

রেলে অন্তর্ঘাত রুখতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ই নভেম্বর রবিবার নালিকুলে একটি সভায় মমতা বলেন, যে সমস্ত মানুষেরা বিপদ আঁচ করে আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে রক্ষা করবেন কোনও ট্রেনকে তাঁদের সরাসরি রেলের চাকরিতে নেওয়া হবে। আর রেলে কর্মরত কোনও ব্যক্তি এই কাজ করলে তাঁর প্রমোশন হবে। বোঝাই যাচ্ছে, ট্রেনে হামলা রুখতে মা, মাটিতে সেভাবে আস্থা না রাখতে পারলেও মানুষে দিব্যি ভরসা করছেন তিনি। তবে সেই মানুষটি মুসলমান হলে তাঁর চাকরি কিংবা প্রমোশন-এর সাথে ফাউ হিসেবে আর কি জুটবে তা অবশ্য বলেননি মমতাদেবী।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বন্দেমাতরম্ ও ইসলামী অসহিষ্ণুতা

গত ৩রা নভেম্বর '০৯ জমিয়ত-উলেমা-ই-হিন্দ পুনরায় 'বন্দেমাতরম্'-এর বিরুদ্ধে দারুল-উলুমের ফতোয়াকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে। ২০০৬ সালে দারুল উলুম একই ফতোয়া দিয়াছিল। তাহাদের মতে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' ইসলাম বিরোধী। বন্দেমাতরম্ নাকি তাহাদের একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাহাদের দেশপ্রেম, আল্লার প্রতি তাহাদের প্রেমের উর্ধ্বে হইতে পারে না। কারণ তাহারা আল্লাকে ছাড়া কাহাকেও পূজা করার কথা চিন্তা করিতেও পারে না। দেশেমাতৃকাকে তাহারা তাই পূজা করা গুনাহ্ অর্থাৎ পাপ বলিয়া মনে করে।

তাহা হইলে স্বামীজী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, "বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাত্মবোধ জাগিবে ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় দর্শনের 'বহুত্বে একত্ব' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে" তাহার কী হইবে? যে জাতির ভিত্তি ভারতীয় দর্শন নয়, অন্য কোন জাতীয় দর্শন; সেই জাতি কখনও একটি সুদৃঢ় জাতি গঠনে সহায়ক হইতে পারে কিনা আজ সকল জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলিকে তাহা নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে। মুসলমানগণ একেশ্বরবাদী বলিয়া নাকি জাতীয় ভূখণ্ডকে মাতৃভূমি রূপে বন্দনা করিতে পারিবে না। ইহাও জ্ঞাত হইয়াছে যে, ইসলামে না কি জাতীয়তাবাদই নাই। প্যান-ইসলামিজম্ অর্থাৎ ইসলামী-বিশ্বই তাহাদের লক্ষ্য। অতএব মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়কে লইয়া জাতীয় সংহতির স্বপ্ন দেখা হিন্দুস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে বেয়াদবি হইবে। সততা, সরলতা, সহিষ্ণুতা—খুবই আদর্শ গুণাবলী। কিন্তু এই গুণগুলির সঙ্গে যদি নিজস্ব কাণ্ডজ্ঞানবোধ না থাকে তাহা হইলে এই ধরনের সহস্র গুণধরদেরও অস্তিত্বের সংকট দেখা দিতে পারে। ধর্মযুদ্ধ লড়িতে গেলেও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধির দরকার হয়, না হইলে নিশ্চিত জয়লাভও কাঁচিয়া যাইতে পারে। কৌরব সেনা ও বীরগণ নিহত হইবার পরও কেবলমাত্র দুর্যোধনকে যুদ্ধজয়ের সুযোগ করিয়া দিয়া যুধিষ্ঠির যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সমস্ত কৌরববীর নিহত হওয়ার পর দুর্যোধন যখন প্রাণ ভয়ে হ্রদের নীচে মন্ত্রবলে আশ্রয় লইয়াছিল তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে পঞ্চ পাণ্ডবের যে কোনও এক ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জিতিয়া রাজ্যলাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এ এক ভয়ানক নির্বুদ্ধিতা ছিল কারণ দুর্যোধন ছিল বিশ্বের এক নম্বর গদাযোদ্ধা। ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষে এক মিনিটও লড়াই করা অসম্ভব ছিল। দুর্যোধন যদি সেদিন অনুজ পাণ্ডবকে যুদ্ধে বাছিয়া লইতেন তাহা হইলে শর্ত অনুযায়ী দুর্যোধনই পুনরায় রাজ্যলাভ করিত; অর্থাৎ অধর্মেরই জয় হইত। ভীমও যদি ন্যায়পূর্বক যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে সেও জিতিত না।

স্বাধীনতার সময় কংগ্রেস নির্বুদ্ধিতা করিয়াছিল। মুসলমানরা যখন দাবী তুলিয়াছিল যে তাহাদের পক্ষে হিন্দু শাসিত হিন্দুস্থান অর্থাৎ দার-উল-হারব (শত্রু ভূমি)-এ বাস করা সম্ভব নয়, মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র চাই। তখন কংগ্রেসীরা মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র দিয়াছিল বটে কিন্তু সেই সুযোগে হিন্দুস্থানকে পূর্ণ মুসলমানমুক্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই আজ পুনরায় মুসলমানরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতমাতার সন্তানদের আজ দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই কারণ সেই কংগ্রেস দলই আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

মুসলমানগণ ক্রমশ আগ্রাসী রূপ ধারণ করিতেছে। উলেমাগণ আজ ফতোয়া দিয়াছে মুসলমানগণ যাহাতে ইসলামী পোশাক পরে, টিভি, সিনেমা দেখা বন্ধ করে, এইড্স্-বিরোধী প্রচারে অংশগ্রহণ না করে, নিয়মিত নমাজ পড়ে, কোন আইন না মানে, একে অপরকে শুধুমাত্র 'সালাম' করে। তাহারা দাবী করিয়াছে যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিধানসভা ও আইনসভায় মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য বিনা যুদ্ধে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুস্থানকে দখল করিয়া লওয়া। পাকিস্তানে সংসদীয় আসনের সিংহভাগই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। হিন্দুস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য এমন সংরক্ষণ নাই। তাই ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা গণতান্ত্রিক পরাকাষ্ঠা বাহিয়াই একদিন সংসদ দখল করিতে পারিবে। সেদিন বন্দেমাতরম্ গাওয়া হিন্দুদেরও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কিন্তু একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্যদেশে নেশন নানা বিপ্লবে'র মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা কয় হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়ন, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই। এখনও যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম ও ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনও যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরী নিজে আধমরা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এসমাজ আমাদিগকে সুখ বড় বলিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষীয় সমাজ

গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরতন্ত্র

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এটা এখন একেবারে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান স্তম্ভ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল মার্কসবাদের নাম করে—যার তত্ত্ব ও পদ্ধতি দুটোই পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। আর একনাগাড়ে বত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে তাদের মজ্জায়-মজ্জায় স্বেচ্ছাচারিতা ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গে ছোট শরিকরা অবশ্য আছে—কিন্তু বড় শরিকের এঁটো-কাঁটার লোভে সেই 'ক্যাপিটালিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (সি. পি. আই.), 'ফীবল্ ব্লক' (এফ. বি.) ও 'রেভলিউশনারি সাব্-অর্ডিনেট পার্টি (আর. এস. পি.) কুঁই-কুঁই করে তার পেছনে পেছনে ঘুরে মরছে। এই অবস্থায় সি. পি. আই. (এম.) মার্ডারারের ভূমিকা নিয়েছে।

ঝোঁকটা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টকে সঙ্গত কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাচ্যুত করলে মার্কসবাদী (?) দলটা যে তাণ্ডব শুরু করেছিল, তাতে প্রাণ দিয়েছিলেন অন্তত তিরিশজন মানুষ। সাঁইবাড়ির ঘটনা তখনকার। পরে—১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সেই সব মামলা প্রত্যাহার করে নেয়, যার ফলে খুনীরাও নেতার মর্যাদা পেয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে কেশপুর, ছোট আঙারিয়া, সূচপুর, নানুর, কুলতলী, গড়বেতা, দিনাজপুর, বাসন্তী প্রভৃতি স্থানে ক্যাডাররা নারকীয় কীর্তি করেছে। মোটরবাইক-বাহিনী আজও এলাকা দখল করে। উদ্বাস্তুদের ডেকে এনে মরিচঝাঁপিতে মারণযজ্ঞ করেছে। গুলি চালিয়ে, গৃহদাহ করে, বাঘ-কুমীরের মুখে ছেড়ে দিয়ে কয়েক শো' উদ্বাস্তুকে হত্যা করা হয়েছে। বানতলায় 'ছেলেধরা' অপবাদ দিয়ে কয়েকজনকে শেষ করা হয়েছিল—একজন সেবিকাকে নির্মমভাবে অত্যাচারিত করে পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরানো হয়েছিল—পোস্টমর্টেমের সময় তাঁর ক্ষত-বিক্ষত নিম্নাঙ্গ দেখে লেডি-ডাক্তার মূর্ছিতা হয়েছিলেন। তার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 'মনীষী' ডঃ জ্যোতি বসু বলেছিল—এই রকম কতই তো হয়।

না, এইসব ক্ষেত্রে কারও শাস্তি হয়নি। কারণ কম্রেড্রা অপাপবিদ্ধ।

ধ্বংসাত্মক ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে এই রাজ্যের সর্বনাশ করে ফেলার পর হঠাৎ কর্তা-ব্যক্তিদের মনে হয়েছে শিল্পই মুক্তি ও সমৃদ্ধির পথ। পঞ্চাশ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে—বিভিন্ন কারখানার জমিতে গড়ে উঠেছে বড়লোকি 'মল' ও 'হাউসিং'। কিন্তু কেড়ে নিতে হবে কৃষি জমি? সেখানে পুঁজিপতিদের শিল্প গড়তে দিতে হবে, লেনদেনটা হয়ে গেছে গোপনে—সেটা 'ট্রেড্-সিক্রেট'। এই রাজ্য কৃষিতে বেশ পিছিয়ে আছে। আলু, চাল, আর সবজি ছাড়া সব আনতে হয়। তবু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের উর্বর জমি কেড়ে নেওয়ার ছক তৈরি করা হয়েছিল। সিঙ্গুরে প্রাণ দিয়েছিল এক কিশোর। আর তাপসী মালিককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল নির্মমভাবে। নেতাদের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে গৃহপালিত পুলিশ এটাকে আত্মীয়দের দ্বারা বা ব্যর্থ প্রেমজাত আত্মহত্যা বলে চালাতে চেষ্টা করেছে।

নন্দীগ্রামে অন্তত চৌদ্দ জনকে হত্যা করা হয়েছিল, জমি দখলের নামে। তাতে আহত হয়েছিলেন দেড়শ' কৃষকও। গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন, গ্রেপ্তার ইত্যাদি চলেছিল অবাধে। পৃথিবীর কোনও দেশে এই পদ্ধতিতে শিল্পায়ন হয়েছে বলে আমরা জানি না। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পতিত, বন্ধ্যা ও এক ফসলি জমি পড়ে আছে। খালি আছে বন্ধ-চা-বাগানের জমিও। কিন্তু বিদেশী সালিমের জন্য ৬৫০০ একর জমির দখল নিতে লুঠেরা সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

> **"সরকারের উচিত ছিল সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে জঙ্গলমহলের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শোনা ও সব সমস্যা দূরীকরণের কাজ শুরু করা। তার বদলে নামানো হয়েছে যৌথবাহিনী—তার উদ্দেশ্য হলো সমস্ত এলাকা দখল করে ক্যাডারদের হাতে তুলে দেওয়া।"**

দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল—সেই জমির দখল সরকার নেবেই।

পরে অবশ্য তাকে হার মানতে হয়েছে। কিন্তু এই নরহত্যার দায়টা কার? মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রী আগে বলেছিল—এই সব মৃত্যু, অশ্রু, নির্যাতন ঘটবে—তা সে জানত না। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদরঞ্জন রায়। তিনি বলেছিলেন—মুখ্যমন্ত্রীরই আদেশ ছিল—'ব্লো দেম আপ' (ওদের উড়িয়ে দিন)। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর অন্য একটা মিথ্যা বাক্যেরও প্রতিবাদ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল—বিরোধীরা খেজুরীর দিকে (ক্যাডারদের ঘাঁটি) অবিরত গুলি চালায়। অথচ স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছিলেন—ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসে খেজুরীর দিক থেকেই।

বলা বাহুল্য, তারপর তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পদত্যাগ করা উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীরই। এত হত্যা, এত অশ্রু, এত নির্যাতনের মূলে তো এই ব্যক্তি। কিন্তু না—কম্রেডরা দেহত্যাগ করে, পদত্যাগ করে না। তারপরেও গত নভেম্বরে এক নারকীয় তাণ্ডবের মধ্যে নন্দীগ্রামে 'সূর্যোদয়' ঘটানো হয়েছে। উল্লাসে মত্ত হয়ে ভুল ইংরেজীতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—ওদের ইটের বদলে পাটকেল মারা হয়েছে।

রাজ্যপালের উদ্যোগে অবশেষে রাজভবনে সরকারের সঙ্গে বিরোধী নেত্রীর চুক্তি হয়েছে কিছু জমি ফেরৎ দেওয়া নিয়ে। তাতে সরকারের তরফ থেকে শিল্পমন্ত্রী স্বাক্ষর করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সহাস্যে বিরোধী-নেত্রীকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। অথচ পরের দিনই সরকার ডিগবাজি খেয়ে সেই চুক্তি নস্যাৎ করে দিয়েছে। এটা নোংরা স্বৈরতন্ত্রেই ঘটতে পারে।

নয়াচরে 'কেমিক্যাল হাব্' নিয়ে সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ডঃ পার্থসারথি রায়, মৃন্ময় চন্দ, ডঃ অভী দত্তমজুমদার প্রমুখ এই 'হাব্'-এর বিষময় ফলাফল সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করা সত্ত্বেও সরকার এই ব্যাপারে এগোতে চায়। জনকল্যাণ বা নিরাপত্তা নয়—তার লক্ষ্য প্রাপ্তির তৃপ্তি।

অণ্ডালের কথাও মনে করুন। সেখানে একটা জমি 'এয়ারোট্রোপলিস' প্রকল্পের জন্যে বেসরকারি সংস্থাকে রীতি বহির্ভূতভাবে দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য সরকারি কোষাগারের বিপুল ক্ষতি করা হয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে—তাতে আছে বিরাট কয়লা-ভাণ্ডার। এর ফলেও শুরু হয়েছে এক বড়সড় আন্দোলন, কারণ রক্ষা করা দরকার সেই ৩,৫০০ একর জমি। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার সংশোধন করবে তার জমি-গ্রাসের সর্বনাশা নীতি?

কিন্তু লালগড়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই স্বৈরাচারী সরকারকে একেবারে উলঙ্গ করে দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাষট্টি বছর কেটে গেছে—কিন্তু মানুষের একটা বড় অংশের দুঃখ, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অবিচার দূর হয়নি। বিশেষ করে, গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ এবং জনজাতি মানুষরা চূড়ান্ত অবিচার ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে আছেন। হাজার হাজার মানুষ এই রাজ্যে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটান; পিঁপড়ের ডিম, ডুমুর, শাক-লতাই তাঁদের সম্বল। না আছে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওষুধ-পথ্য, রাস্তা-ঘাট, এমনকী পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই। জীবিকার জন্য কৃষি বিপ্লব, শিল্প পত্তন—কিছুই হয়নি। একনাগাড়ে বত্রিশ বছর ধরে 'সর্বহারার' দল—অর্থাৎ বামপন্থীরাও কিছুই করেনি। রেশনের খাদ্য অন্যত্র বিক্রি হয়, মিড্-ডে মিল্ চুরি হয়, উন্নয়নের টাকায় নেতাদের সমৃদ্ধি ঘটে।

অথচ সেই সরকারই 'কিল মারার গোঁসাই'। মুখ্যমন্ত্রীর কন্‌ভয়ে মাইন-বিস্ফোরণের সাজানো নাটক হতেই শুরু হয়েছিল পুলিশী অত্যাচার। নির্বিচারে ধরপাকড় ঘটেছে, চলেছে ভীতি-প্রদর্শন। মাওবাদী ছেলেরা ছদ্মবেশ নিয়েছে কিনা—সেটা বোঝার জন্য মেয়েদের নগ্ন করা হয়েছে। ধরা হয়েছে ৬০ বছরের বৃদ্ধাকেও।

তার ফলে দেখা দিয়েছে এক বিরাট জনবিদ্রোহ। গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ-কমিটি।

সরকারের উচিত ছিল সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে জঙ্গলমহলের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শোনা ও সব সমস্যা দূরীকরণের কাজ শুরু করা। তার বদলে নামানো হয়েছে যৌথবাহিনী—তার উদ্দেশ্য হলো সমস্ত এলাকা দখল করে ক্যাডারদের হাতে তুলে দেওয়া। মুক্তাঞ্চলে ক্যাডারদের অনুপ্রবেশের স্থিরচিত্র সবাই সংবাদপত্রে

(এরপর ৪ পাতায়)

কৃষকদের আত্মহত্যা বাড়ছে ওড়িশায়

সংবাদদাতা।। নবীন পট্টনায়কের মুখ্যমন্ত্রীত্বে ওড়িশায় কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা বিরামহীনভাবে লাগাতার ঘটে চলেছে। ঋণ-শোধ করতে না পেরেই কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে।

এরকম একটি ঘটনা সদ্য ঘটেছে বালেশ্বর জেলার বালেশ্বর সদর ব্লকে। কিছুদিন আগেই সম্বলপুর জেলায় কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ও কর্মকর্তারা। বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে এবং বিক্ষোভকারীদের কেউ জেলা কৃষি অধিকর্তার মুখে কালির পোঁচ লাগিয়ে দেয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বালেশ্বরবাসী জনৈক দিলীপ ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। দিলীপ সমবায় থেকে দশ হাজার টাকা ধার করেছিল। পরপর বিগত তিন বছর ফসল ঠিকমতো হয়নি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে। সমবায় সমিতি থেকে দিলীপকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। ১০ হাজার টাকার ঋণের পরিবর্তে তাকে ২৯,২৭৫ টাকা দেওয়ার জন্যে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এজন্য দিলীপ খুবই মনমরা অবস্থায় ছিল। শেষপর্যন্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

এদিকে আত্মহত্যাকারী কৃষকের সূচীতে নতুন আরও একটি নাম হল নবরংপুর জেলার চাষী সুনীল সুতার। সুনীলের বড়দা নির্মল সুতার জানিয়েছেন, সুনীল স্থানীয় ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ এবং এক মহাজনের থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার এটাকে প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলেই সন্দেহ করেছেন।

দামোদর রাউৎ - রাজ্য কৃষিমন্ত্রী

সম্প্রতি, ওড়িশায় ঋণের দায়ে কৃষকের আত্মহত্যার এটি পঞ্চম ঘটনা ছিল। অপরপক্ষে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দামোদর রাউৎ বলেছেন—কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনার তদন্ত হবে। বালেশ্বর জেলা বি জে পি'র কয়েকজনের এক প্রতিনিধিদল বালেশ্বরে দিলীপের বাড়িতে গিয়ে শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন। ভুবনেশ্বরে রাজ্য বিজেপি নেতা নয়ন মহান্তি এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান কৃষকদের আত্মহত্যার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের পদত্যাগ দাবী করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, গত ১৩ বছরে প্রদেশে কৃষিজমির পরিমাণ ৭.৭ শতাংশ কম হয়েছে। বিগত কুড়িবছরে ওড়িশায় ধান উৎপাদন ৬.৮ শতাংশ, ডাল ৪৬.৪ শতাংশ এবং তৈলবীজ উৎপাদন ৪৪ শতাংশ কমেছে। ফসল উৎপন্ন না হওয়াতে অথবা কৃষিতে লোকসানের কারণে ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ওড়িশায় ২৪১১ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি

(১ পাতার পর)

পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রের প্রতি। আনিসুর রহমানের আগে পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন এই সূর্যকান্ত মিশ্র। মূলত তাঁর আমলেই পঞ্চায়েতে রাজনীতিকরণ, দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণ চরমমাত্রায় পৌঁছে যায়। আনিসুর রহমানের বক্তব্যেও পরোক্ষে সূর্যকান্তের দিকে আঙুল উঠেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আব্দুল হালিম বলেন—"১৯৭৭-এ আমি যখন রাজ্যের আইনমন্ত্রী ছিলাম, তখন বলেছিলাম যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজনৈতিক দলের প্রতীকে হয় তবে সমগ্র ব্যবস্থাটার রাজনীতিকরণ এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।" প্রশ্ন উঠছে, আজ যখন পার্টি গদিচ্যুত হতে বসেছে তখন এসব কথা মনে পড়ছে! এতদিন বোধোদয় হয়নি কেন?

আলিমুদ্দিনকে পাত্তা দিচ্ছে না

(১ পাতার পর)

অভিযোগ। তাঁরা ঝাঁ চকচকে মার্বেলের বাড়ি বানিয়েছেন। তাঁরা স্করপিও, প্যাজেরো ছাড়া অন্য কম দামের গাড়িতে চড়েন না। ইজ্জতে লাগে। এইসব দামি গাড়ি চড়েই তাঁরা আলিমুদ্দিনে দলের বৈঠকে যান। সুতরাং বিমানবাবুর এই হঠাৎ কোটিপতি হওয়া কমরেডদের জীবনযাত্রা যে এতকাল অজানা ছিল, তা নয়। অতীতে তিনি বহুবার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে একাধিকবার বলেছেন এরা সব সি পি এমকে 'কামাই পার্টি' অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)' করে দিয়েছে। এদের পার্টির আদর্শ, আত্মত্যাগ ইত্যাদির কথা বললে জবাব দেয়, 'ও-সব অতীত ইতিহাস। আজকের দিনে অচল।'।

লোকসভার নির্বাচনে পরাজয়ের পরেই পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফতোয়া জারি করেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটির প্রতিটি সদস্যকে আবশ্যিকভাবে তাঁদের নিজস্ব এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তির তালিকা বিমানবাবুকে দিতে হবে। কিন্তু কতজন সদস্য সেই তালিকা বিমানবাবুকে দিয়েছেন? যে কয়েকজন আঙুলে গোনা সদস্য সম্পত্তির তালিকা দলের রাজ্য সম্পাদককে জমা দিয়েছেন তা সঠিক নয়। যেমন, প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন যে সল্ট লেকে তাঁর প্রাসাদতুল্য বাসভবনটি তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন। কী খুশিতে 'বন্ধুবর' তাঁকে উপহার দিয়েছেন সে কথা জানাননি। সুভাষবাবুর মতোই রাজ্য কমিটির অধিকাংশ সদস্যেরই নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি কিছুই নেই। সবই তাঁদের অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবরা ভালবেসে ব্যবহার করতে দিয়েছে। এত ভালবাসা সত্ত্বেও নির্বাচনে কেন এমন গোহারান হারতে হচ্ছে তা তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না।

পার্টির রাজ্যস্তরের নেতারা তাঁদের বন্ধুদের এমন ভালবাসা পেতেই পারেন। কারণ তাঁদের আলিমুদ্দিন থেকে মহাকরণ—সর্বত্র অবাধ যাতায়াত। বন্ধুদের ভালবাসার প্রতিদান কীভাবে দিতে হয় তা জানেন। কিন্তু দূরের জেলাস্তরের কমরেডদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াটাকে বিমানবাবুরা মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। রাজ্যস্তরের নেতাদের পাঠানো ভেট আলিমুদ্দিনে নিয়মিত যায়। জেলার কমরেড নেতাদের কাছ থেকে কলাটা মূলোটাও এখন আসে না। তারা নিজেরাই খায়। আলিমুদ্দিনের ঘরে বসা নেতাদের জেলার কমরেডরা পাত্তাই দিচ্ছে না। বিমানবাবুদের এখন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল অবস্থা। তা না হলে হুগলির জেলাস্তরের নেতা অনিল বসুকে দলের রাজ্য সম্পাদক বারণ করার পরেও তিনি বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেন কীভাবে? দলের নেতা কর্মীদের রাজকীয় চাল-চলন, বিত্ত বৈভব সবই বিমানবাবুদের জানা। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সাহস বা ক্ষমতা তাঁদের নেই।

গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরতন্ত্র

(৩ পাতার পর)

দেখেছেন। কোনও মার্কসবাদী দলের সরকার এভাবে অত্যাচারের রথচক্র চালাতে পারে বঞ্চিত-শোষিত মানুষদের ওপর? এবার দুর্নাম দেওয়া হল—মানুষের এই প্রতিরোধ প্রয়াস নাকি মাওবাদীদের সর্বনাশা কীর্তিকলাপ। প্রশ্ন হল— জঙ্গল -মহলের সবাই মাওবাদী? আর কয়েক মাস ধরে অভিযান চালিয়ে কয়জন মাওবাদীকে ধরা গেছে? কেন ব্যর্থ হলো এই বিশাল অভিযান? আরও বড় কথা হলো—বঞ্চনা ও অন্যায় শিকড় গেড়ে ফেললে মাওবাদী প্রচারে তো মানুষ সাড়া দেবেনই। অন্যায় ও দুঃখকে জিইয়ে রেখে পুলিশ দিয়ে মানুষকে শাসন করতে হবে?

এক্ষেত্রে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে পড়েছে—

● জঙ্গলমহলের মানুষদের নেতা ছত্রধর মাহাতোকে সাংবাদিকের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ধরতে হলো কেন? এটা কোনও সভ্য সরকার করতে পারে? এতে তো সাংবাদিকতা-বৃত্তিরই অবমাননা করা হলো—একথা কর্তাব্যক্তিরা বুঝেছে?

● ছত্রধর মাহাতোকে আগে মহাকরণে ডেকে কর্তাব্যক্তিরা বৈঠক করেছিল। তাঁর কথা শুনে সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করাটাই উচিত ছিল না? তার বদলে দেওয়া হয়েছে যৌথবাহিনীর মাধ্যমে পুলিশী ব্যবস্থা। ভুলের পর ভুল করে যাওয়াই কি মার্কসবাদীদের ঐতিহ্য?

● কিছু মেরুদণ্ডহীন আমলা সদম্ভে ঘোষণা করেছিল যে, যেসব বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞরা শ্রীমাহাতোর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাঁদেরও ছাড়া হবে না। কিন্তু শ্রীমাহাতোর সংস্থা তো নিষিদ্ধ ছিল না—তাহলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আপত্তি উঠবে কেন?

এক বড় আমলা বলেছিল—আইনের চোখে সবাই সমান। আইন তার নিজের পথে চলবে, দরকার হয় পূর্বোক্ত ব্যক্তিদেরও জেরা বা গ্রেপ্তার করা হবে।

আমরা জানতাম আমলাদের কাজ নেপথ্যে। তাঁরা ভাষণ বা বিবৃতি দেন না। কিন্তু এখন দেখছি তারা দূরদর্শনের সামনে মুখ দেখানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। অবশ্য যেই মহাশ্বেতা দেবী ফুঁসে উঠেছেন এবং মমতা ব্যানার্জী একটা হুঙ্কার ছেড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই সব কর্তাভজা আমলার গলার সুর নেমে গেছে। এবার তারা জানাল—ওই সব কবির কবিতা তাদের মুখস্থ, কোনও অভিনেত্রীর কানের লতি অতি সুন্দর, চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি তাদের শিয়রে থাকে ইত্যাদি।

এমনটাই হয়। এগারো জনকে ডিঙিয়ে কেউ কেউ প্রমোশন পায়, কেউ পায় জমি, কেউ পায় পছন্দমতো পোস্টিং। শুনেছি এরা পড়াশোনায় ভাল ছিল—কিন্তু মুচি, মেথর বা ডোমের কাজ করলে এদের আত্মমর্যাদা ও সম্মান বজায় থাকত।

● এই স্বেচ্ছাতন্ত্রে আইন নিজের পথে চলে? এরাই বলুক—গত সংসদীয় নির্বাচনের আগে ৭০ হাজার জামিন-অযোগ্য ওয়ারেন্ট বিভিন্ন থানায় জমে গিয়েছিল কেন? কেনই বা একক ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়ে দুজন মন্ত্রী সগর্বে মন্ত্রিত্ব করে গেছে? কেন জননী ইটভাটায় ধৃত ক্যাডাররা ছাড়া পেল? কিভাবে বাইক-বাহিনী গ্রাম-গঞ্জ দখল করে? শাসক-দলের নেতারা জঙ্গিদের ভাষায় হুমকি দেয়? কেন এই ধরনের নেতাদের বাড়িতে মজুত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়না? কেমন করে ক্যাডাররা পুলিশের উর্দি পরে খালি পায়ে পুলিশী অভিযানে অংশ নেয়?

আমলা ও পুলিশ-অফিসাররা বেতন নেয় কার কাছ থেকে? এটা গণতন্ত্র, নাকি এখানে আইনের শাসন আছে? কোনও বড় নেতা কদর্য ও পাশব ভঙ্গিতে বিরোধী-দলের কয়েকজনের নামের লিস্ট দিয়ে পুলিশকে আধ ঘণ্টা সময় দেয় তাদের গ্রেপ্তারের জন্য এবং পুলিশ ঊর্ধশ্বাসে তাদের হাজতে পুরে ফেলে—এটা গণতান্ত্রিক সমাজে হতে পারে?

● এই সরকার বারবার বলেছে—মাওবাদীদের রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করা হবে? তাহলে যৌথবাহিনী কেন? মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় সরকার নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু রাজ্য সরকার করেনি। তাহলে কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে ছত্রধর মাহাতোকে ১৫ দিনের বেশি হাজতে রাখতে হবে কেন? আদালতে সুবিধে করতে না পেরে পুরনো মামলা দিতে হচ্ছে কি কারণে? আচ্ছা, অগুালে দলের শান্তি-মিছিলে সশস্ত্র ক্যাডাররা ছিল কেন? গোয়ালতোড়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শাসক-দল সশস্ত্র মিছিল করল কেমন করে? এটা খানাকুলেও হলো কোন্ যাদুমন্ত্রে? আইনের শাসন কোথায় গেল? অথচ বুদ্ধিজীবীদের বারবার আটকে দেওয়া হয়েছে। মমতা ব্যানার্জীকে আটকে দিয়েছে পুলিশ বা ক্যাডারবাহিনী। কবি জয় গোস্বামী লিখেছেন, রবীন্দ্র সদনের সামনে এক পুলিশ-অফিসার গর্জন করেছে—'উঠাও সব শালেকো।' চিত্র-পরিচালক সুপ্রিয় সেনকে মারতে মারতে ভ্যানে তোলা হয়েছে, এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পীকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, ধরা হয়েছে বিখ্যাত অভিনেতাকে। কলাকুশলী-অভিনেত্রীদেরও লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—গেটের বাইরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কবি শঙ্খ ঘোষ, অপর্ণা সেন প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা (সংবাদ প্রতিদিন)। তাঁদের অপরাধ—তাঁরা ১০ই নভেম্বরের নন্দীগ্রামের নারকীয় সূর্যোদয়ের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন? এটাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিদর্শন? আরও বড় কথা—বন্দী ও. সি.-র মুক্তির বিনিময়ে ২৩ জন নিরপরাধ নারীকে ছেড়ে দিতে হল কেন?

● সব শেষে বলি—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার কিন্তু বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলে নীতি নির্ধারণ করেন। স্যার জেনিংস লিখেছেন—'Thus, the opposition is an essential part of the House of Commons'—(দ্য কুইন্'স্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৮৭)। আর ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন—'The Government can learn more from the criticism of the opponents than from the eulogy of its supporters।' কিন্তু আমাদের অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী সদম্ভে বলে—'আমাদের ২৩৫, ওদের ৩০।'

সুবিচার, উন্নয়ন, শিক্ষাবিস্তার, জনকল্যাণ ও সেবাব্রত দিয়ে সব কিছুর সমাধান করা যেত—কিন্তু সরকার নিয়েছে দমন-পীড়নের নীতি। ডঃ বাসুদেব চ্যাটার্জী লিখেছেন—পুলিশ দিয়ে সবকিছু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় 'without dealing with economic and political problems—(পুলিশ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃঃ ১৬৩)। আর পদ্মা রামচন্দ্রন মনে করেন, এর মাধ্যম হলো আমলাতন্ত্রকে লোভ ও ভয় দেখিয়ে বশে রাখা (পাবলিক অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৫১)।

এই স্বৈরতন্ত্র টিকে থাকতে পারে?

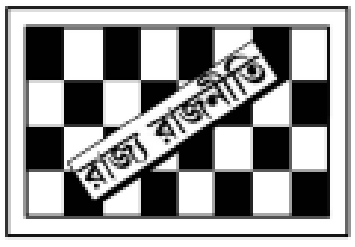

ধান্ধাবাজরা সি পি এম থেকে তৃণমূলে ঢুকছে

নিশাকর সোম

রাজ্যের দশটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে—তৃণমূল-৭, কংগ্রেস-১, মোর্চা (গুরুং)-১, ফরওয়ার্ড ব্লক-১। ভোটের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট সিপিএম-এর পরাজয় অব্যাহত। এই কলামে একাধিকবার লেখা হয়েছিল—সিপিএম-এর কোমর ভেঙে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর অবস্থা ফিরে পাবে না। কেন এই অবস্থা? এর কারণ সিপিএম-নেতৃত্ব আত্মসমালোচনা থেকে দূরে হাঁটছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতারা বলেছিলেন—যে কমিউনিস্ট নিজের দোষ স্বীকার করে তারাই সত্যিকারের কমিউনিস্ট।

১৯৪২ সাল, সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন প্রভৃতি ব্যাপারে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ প্রথম সাধারণ-নির্বাচনের প্রাক্কালে কলকাতাতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের একজন সভায় এই ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন। সাম্প্রতিক অতীতে সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সিপিআই প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে হরিদাস মালাকারকে (কমরেড লাল) দাঁড় করিয়ে স্লোগান দিয়েছিলেন "সোমনাথ লাহিড়ীর জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে।" সোমনাথ লাহিড়ী ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে পরাজিত হননি। পরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের নির্বাচনোত্তর জনসভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজের অতিশয়োক্তির ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন।

এই ঘটনা সিপিএম-এর বর্তমান অহংসর্বস্ব নেতাদের কাছ থেকে আশা করা বৃথা।

সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের কাছে নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা, তাঁদের প্রতি আস্থা—এর মান্যতা তলানিতে নেমে গেছে। নিচের তলার কর্মীদের বক্তব্য, বুদ্ধ বাবু যখন শূন্যগর্ভ আস্ফালন করেন—তখনই পার্টির নতুন করে বিপর্যয় ঘটে। কেউ আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন—বুদ্ধ বাবু ভস্মলোচন। যেদিকে তাকান সেটাই ভস্ম হয়ে যায়। তাঁদের বক্তব্য জনসভায় বেলা ৪টায় বুদ্ধ বাবু বল্লেন—"আমরা মাওবাদীদের এ-রাজ্য থেকে তাড়াবোই।"

দু'ঘণ্টা পরে বেলা ৬টায় গিধনিতে চার জন জওয়ানকে মাওবাদীরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে নিহত করল। শোনা যাচ্ছে—এই অপারেশন নাকি মহিলা মাওবাদীরা করেছেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে নিচের তলায় প্রশ্ন উঠেছে প্রায় এক বছরের বেশি সময়ে যৌথ-বাহিনীর অভিযান চলছে—ফলাফল শূন্য।

যৌথ-বাহিনীর অভিযানের আগেই মাওবাদীরা নাকি খবর পেয়ে যায়? কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর সন্দেহ এটা রাজ্য-বাহিনীর-রাজ্য-পুলিশ সূত্রে এই নিউজ লিক হয়ে থাকে। মাওবাদীদের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক নিয়ে তো রাজ্য-প্রশাসন স্তরেই দ্বিমত দেখা গেছে।

সিপিএম-এর নিচের তলায় ব্যাপক কর্মী বসে যাচ্ছেন। কিছু অসৎ ব্যক্তি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। তৃণমূল সিপিএম-এর অ্যাকশন বাহিনীকে সাদরে গ্রহণ করছে। আজকে নিচের তলার কর্মীরা মনে করেন পার্টির সিস্টেম-নেতাদের পরিবর্তন দরকার। সংবাদপত্রে প্রকাশ, মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন—"পার্টিতে ভেজাল কর্মী-নেতা রয়েছে। তাঁদের দূর করতে না পারলে কিছুই হবে না।"

পার্টি-প্রশাসন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধনদের—সমর্থন করেই চলেছে। যতদিন না ধ্বংস হবে এই ধৃতরাষ্ট্র-সুলভ আচরণ চলবেই। নিচের তলার কর্মীরা বলছেন-সেই এক ঘেয়ে জমায়েত নেতাদের সেই এক ঘেয়ে ক্যাকোফনিক বক্তৃতা দিয়ে জনগণ তো দূরের কথা—পার্টির কর্মীদেরও উজ্জীবিত করা যাচ্ছে না, যাবে না। এই বক্তৃতা শুনে কেহই জিন্দাবাদ বলেন না, শুধুই নিন্দাবাদ করেন।

নিচের তলার কর্মীদের নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণ হল—রাজনীতি বা আদর্শের কথা "দাদাদের" কাছ থেকে শেখেনি—শিখেছে পার্টি সম্মেলনে গোষ্ঠীবাজি করে হারা-দেবতা ঠিক করতে "দাদার গোষ্ঠী" জিতে পার্টির ক্ষমতায় এলে পুলিশ প্রশাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে চমকাতে পারা যাবে—পয়সাও হবে। ফলে এখনও এই ধান্দাবাজ কর্মীরা দেখছে যে ধান্দা ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। ক্ষমতা ধীরে ধারে তৃণমূলের কাছে যাচ্ছে, তাই সময় থাকতে ঢুকে পড়। এ-ব্যাপারে আরও উৎসাহ দিল এগরার প্রাক্তন সিপিএম-কর্মী সমরেশ দাশ-এর তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ।

এরকম সমরেশ দাশ সব স্তরের নেতাদের মধ্যে আছে। টিএমসি-এর সঙ্গে, মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে চলেছেন বেশ কিছু নেতা-কর্মী। ২০১১ সালের পর তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবেই। নিচের তলার সিপিএম কর্মীদের বুদ্ধ দেববাবুর "আমরা-ওরা"-এই শূন্যগর্ভ আস্ফালন সম্পর্কে মন্তব্যকে হুমকি দিয়েই তো বদনাম হয়েছিল। তবে সত্যিকারের অ্যাকশন নেওয়া হলো না কেন? পার্টিনেতাদের হুমকি-কে হাসির খোরাক বলে মনে করেন সিপিএম-কর্মীরা। পার্টি-নেতৃত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা তৃণমূল একদম কিছু করেনি। কোনও কর্মীকে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে অশোক ঘোষ তো এক সময়ে মমতাকে আমাদের নেত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক কি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই সুবিধা পাবে?

এই কলামেই লেখা হয়েছিল—কিরণময় নন্দের সঙ্গে কিছু "মউ" হয়েছে? এর কারণ হলো কিরণময় নন্দ বিমান বসুর ঘনিষ্ঠ হয়েও বারবার নির্বাচন এগিয়ে আনার কথা বলছেন কেন? তাঁদের দলের জেতা তিনটি সিট পূর্ব মেদিনীপুরে—সেখানে তো তৃণমূল রাজ। তো—"মউ" হয়েছে কি?

এবারের নির্বাচনে সিপিএম-এর কাছা খুলে দিয়েছে রাজগঞ্জ এবং পূর্ব বেলগাছিয়া।

পূর্ব বেলগাছিয়াতে তিনদশক ধরে প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী বিধায়ক ছিলেন এবং তাঁরই সৃষ্ট সুজিত বসু সুভাষ জায়াকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছেন। একমাত্র সুকান্তনগর ছাড়া সর্বত্রই সিপিএম গো-হারা হেরেছে। জ্যোতি বসুর বিবৃতি ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়েছে। এসবই সুভাষ চক্রবর্তীর অতীত কৃতকর্মের ফল নয় কি? যে-বিষবৃক্ষ এখানে রোপিত হয়েছিল—তা আজ ফলে-ফুলে মহীরূহতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য রমলা চক্রবর্তী পরাজিত হয়ে ভালো হয়েছে। কারণ তাঁকে ঘিরে নেক্সাস-কক্কাস কাজ চালাতেন—সেই গোষ্ঠী যাঁরা সুভাষবাবুকে ঘিরে রেখেছিল। ফলে পার্টিকে আর সঙ্গীণ অবস্থায় পড়তে হোত না কি? তবে কয়েকটা কথা বলা যাচ্ছে যে—সিপিএম নির্বাচন এগিয়ে আনবে না। প্রশাসনও আর সক্রিয় করতে পারবেন না নিন্দিত মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে যখন পার্টি হারছে—তখন প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত বিলেতে বেড়াতে গেলেন আর সীতারাম ইয়েচুরি স্পেনে বসে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করছেন। হেলে সাপ ধরতে পারে না—আবার কেউটে ধরতে চায়। এও একপ্রকার ঔদ্ধত্য।

যেদিন পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনের বিপর্যয় প্রকাশিত হল—সেইদিন মুখ্যমন্ত্রী বিদেশী ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ ছিলেন। রোম যখন পুড়ছিল নীরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। সিপিএম-এর নীরো'রা মজায় আছেন। সুযোগ মতো কে কোথায় যাবেন তা ঠিক করাই আছে।

তবে পার্টির রাজ্য কমিটির মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে—বুক ফাটছে মুখ ফুটছে না। কিসের ভয়ে? সকলেরই তো পেছনে কাদা আছে—তাই নয় কি? পার্টির নিচের তলায় ধস্ নেমে যাবে। সিপিএম নেতারা স্কন্ধকাটা। তাই এসব দেখতে বা শুনতে পান না। লোকে তাঁদের আর বিশ্বাস করেন না।

> **"যেদিন পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনের বিপর্যয় প্রকাশিত হল—সেইদিন মুখ্যমন্ত্রী বিদেশী ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ ছিলেন। রোম যখন পুড়ছিল নীরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। সিপিএম-এর নীরো'রা মজায় আছেন। সুযোগ মতো কে কোথায় যাবেন তা ঠিক করাই আছে।"**

অন্য রকম

চিরন্তন

চিরন্তন শব্দটার সঙ্গে ভারতীয় ফ্যান্টাসির কোথাও যেন একটা অদ্ভুত মিলমিশ রয়েছে। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটা হলো কেবলমাত্র একটা ফ্যান্টাসি (ইংরেজি শব্দ fantasy, যার মানে কল্পনা)। কিন্তু রক্তমাংসের চিরন্তন যে কাণ্ডটি ঘটিয়ে ফেলেছেন তা যে কোনও ফ্যান্টাসিকেও নিঃসন্দেহে হার মানাবে। ভিত্তিও গেম সব ছোটদেরই খুব প্রিয়বস্তু। যার জন্য অভিভাবকদের গঞ্জনা তাদের নিঃসন্দেহে পাওনা—দিন নেই, রাত নেই পড়াশুনো ফেলে চবিবশ ঘণ্টা খালি ভিডিও গেমে মুখ গুঁজে বসে আছে ছেলে! এই গঞ্জনা যে প্রতীকি তাতে কোনও রকম সন্দেহ নেই। নাওয়া-খাওয়া ফেলে কেউ চবিবশ ঘণ্টা ভিডিও গেম খেলতে পারে না। কিন্তু বাবা-মায়েদের ফ্যান্টাসিও এনিয়ে চবিবশ ঘণ্টা অর্থাৎ একটা দিনের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু মুম্বাই-এর কিশোর চিরন্তন পটনায়ক টানা ৪০ ঘণ্টা ২০ মিনিট ধরে ভিডিও গেম খেলে

চল্লিশ ঘন্টা খেলে চলেছে চিরন্তন।

নিজের নাম তুলে ফেলেছে গিনেজ বুক অব্ ওয়ার্ল্ডে। এর ব্যাখ্যা শুনুন গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ক্যারোলিনা থেলিন-এর মুখেই—"গ্রান্ড থেফ্ট অটো ঢদ্দ-এ দীর্ঘতম একনাগাড়ে খেলার রেকর্ড করেছে ভারতের চিরন্তন পাঠক। সে চল্লিশ ঘণ্টা কুড়ি মিনিট খেলেছে। ইতিপূর্বে এক মার্কিন নাগরিক ২৮ ঘণ্টা ১ মিনিট ভিডিও গেম খেলেছিলেন।" গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিউর‍্যাল-ক্যাওস ডট কমে চিরন্তন খেলা শুরু করে প্রায় দশটার সময়। এই খেলা যখন শেষ হয় তখন ঘড়ির কাঁটা ২টো পেরিয়েছে। সেইসঙ্গে ক্যালেন্ডারের পাতাতেও তারিখটা দু'ঘর এগিয়ে গিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ হয়ে গেছে। এই দুদিনের অমানুষিক পরিশ্রম চিরন্তনকে এনে দিয়েছে গিনেজ বুকের পাতায়। আর চিরন্তন শব্দটাকে আরও একবার জড়িয়ে দিয়েছে ফ্যান্টাসির সাথে।

সংকটে পড়েছে উলফা

ভারত-বাংলাদেশ বৈঠকের আগে ব্যবস্থা নিচ্ছে বাংলাদেশ

পারমিতা লিভিংস্টোন

আগরতলা ঃ উলফার দুই শীর্ষ নেতা স্বঘোষিত বিদেশ সচিব সাসা চৌধুরী এবং অর্থ সচিব চিত্রবন হাজারিকার বাংলাদেশ থেকে অন্তর্ধান নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। সরকারি তরফে কোন উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো সারাদিন খবরের সত্যতা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পদস্থ অফিসার বললেন, 'এক্সট্রাডিশন ট্রিটি নেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে। জঙ্গিরা যেভাবে ঘাঁটি গাড়ছিল তাতে যে কোন দেশই আতঙ্কিত হতে বাধ্য'। পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের জেরে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যাচ্ছে না। সবটাই পারম্যুটেশন-কম্বিনেশন-এর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর ছিল গত ৩ নভেম্বর দুপুরে বাংলাদেশের উত্তরার সেক্টর-৩ থেকে সাসা চৌধুরী এবং চিত্রবন হাজারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা।

দু'দেশের তরফে ঘটনার সত্যতা স্বীকার না করলেও উলফার মুখপাত্র ই-মেলে প্রচার মাধ্যমের কাছে ফলাও করে জানান দিয়েছে। একটি সংবাদ সংস্থাকে এক অফিসার জানান, 'বাংলাদেশ পুলিশ দুই উলফা নেতাকে ভারতীয় গোয়েন্দা অফিসারদের কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তী সময়ে ধৃত দুই নেতাকে গোকুলনগরে এনে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করানো হয়। এক্সট্রাডিশন ট্রিটি না থাকায় এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়।'

এদিকে আগরতলার অপর এক নিরাপত্তা আধিকারিক বলেন, 'সীমান্ত রক্ষী বাহিনী উলফার দুই নেতাকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক করে। পশ্চিম ত্রিপুরার সীমান্ত থেকে ৫ নভেম্বর রাতে বি এস এফ-এর পেট্রোল পার্টি চিত্রবন হাজারিকা এবং সাসা ওরফে শশধর চৌধুরীকে আটক করে'। পরিচয় অজ্ঞাত রাখার শর্তে অফিসারটি এ কথা জানান। অসম পুলিশ-এর আই জি (স্পেশাল অপারেশন ইউনিট) প্রদীপ কুমার সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে এই দুই উলফা নেতাকে নিয়ে অসমের কোন এক গোপন স্থানে গেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। রাজ্য এবং কেন্দ্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যৌথভাবে এই উলফা নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। গত ১ এবং ২ নভেম্বর রাত থেকেই এই ধরপাকড়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ত্রিপুরার মাটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ করলো এবং দুই জঙ্গিসহ শীর্ষ পদস্থ অফিসারকে নিয়ে অসমের উদ্দেশ্যে রওনা হলো অথচ কাক-পক্ষীটি টের পেল না। এই নিয়ে জনমনে প্রশ্নের শেষ নেই।

সরকার যেমন মুখে কুলুপ এঁটেছে তেমনই 'আমরা কিছুই জানি না। টিভিতে দেখেছি। পত্রিকায় পড়েছি।' গৎবাঁধা উত্তর সবক'টি নিরাপত্তা বাহিনীর। এদিকে, ত্রিপুরাস্থিত ২১ সেক্টর অসম রাইফেলস থেকে লিখিত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে স্বঘোষিত লেঃ কর্ণেল শশধর চৌধুরী এবং স্বঘোষিত সার্জেন্ট মেজর চিত্রবন হাজারিকা অসম রাইফেলস-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বা তাদের আসাম রাইফেলস-এর কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে বলে যে কিছু ক্ষেত্রে প্রচার করা হয়েছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। অসম রাইফেলস-এর কোন ইউনিট এই ঘটনার সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়'।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'উলফার সাথে শান্তি আলোচনার জন্য আমাদের দোর উন্মুক্ত। কিন্তু তাদের প্রথমে হিংসার পথ থেকে সরে আসতে হবে এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে হবে।' কিন্তু এই দুই উলফা নেতা রাজ্য পুলিশের কাছে রয়েছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি অস্বীকার বা স্বীকার কিছুই করেননি। স্বভাবতই পরিস্থিতি আরও জট পাকিয়েছে। পদস্থ অফিসার জানিয়েছেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থারা ইতিমধ্যেই ধৃত উলফা নেতাদের উলফার শীর্ষতম নেতার

পরেশ বড়ুয়া

সাথে থেমে থাকা শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করার বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পেরেছেন। উলফার স্বঘোষিত কমাণ্ডার-ইন-চীফ পরেশ বড়ুয়া এই শান্তি প্রক্রিয়ায় কতটা উদ্বুদ্ধ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে পূর্বোত্তরের জঙ্গিদের বিতাড়িত করা সহ তাদে সবক'টি শিবির ধবংস করার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তার আগাম আঁচ পেয়ে পরেশ বড়ুয়া গত সপ্তাহেই চীনের উনান প্রদেশে গা ঢাকা দিয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উনান প্রদেশের নর্থ চাইনা ইণ্ডাসট্রিজ কোর্প (NORINCO) থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়মিতভাবে কিনে থাকে। নরিনকো (NORINCO) বিশ্বখ্যাত কিলার মেশিনগান, সাবমেশিন গান, এ কে ৪৭ রাইফেলস, স্নাইপার এবং পিস্তলের প্রায় আসল অনুকরণ উলফাকে সরবরাহ করে। উলফা এই সমস্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করার পাশাপাশি অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করে থাকে। এদের মধ্যে সি পি আই (মাওবাদী) গোষ্ঠীরাও রয়েছে।

সূত্ররা জানাচ্ছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ভারত বিরোধী জঙ্গি দলগুলোকে বিতাড়িত করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা সহ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যাণ্ড ও নিরাপত্তাবাহিনীর হিটলিস্টে রয়েছে। আগামীদিনে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জঙ্গিদের ঘাঁটি উৎখাত করার পাশাপাশি এন ডি এফ বি-র সার্বভৌমত্বের পক্ষপাতী। রঞ্জন দইমারি সহ এন এল এফ টি-র বিশ্বমোহন দেববর্মা, এ টি টি এফ-এর রঞ্জিত দেববর্মা, সহ উলফার প্রধান পরেশ বড়ুয়া এবং অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেবে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ।

গত ৪ নভেম্বর সিলেট বি এস এফ এবং বি ডি আর-এর পদস্থ অফিসারদের মধ্যে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তার মধ্যে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঠেকানো, সীমান্তে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ এবং সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও বাংলাদেশী নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গি-বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে, কিন্তু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে স্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট সহ অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় নববইটি জঙ্গি শিবির রয়েছে বলে বি এস এফ-এর এক অফিসার জানিয়েছেন। অসম, মণিপুর এবং ত্রিপুরার জঙ্গিদের কিছু স্থায়ী এবং ট্রানজিট ক্যাম্প রয়েছে ভারত-বাংলা সীমান্তে।

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহানির্দেশক স্তরের বৈঠকের আগে সিলেটে এই প্রাথমিক আলোচনা হয়। বি এস এফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার আই জি—এস কে মিশ্র সতেরো সদস্যের ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই দলে রয়েছেন অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, কাছাড় ফ্রন্টিয়ার-এর আই জি বৃন্দ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক পদস্থ অফিসারও রয়েছেন। বাংলাদেশের এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন বি ডি আর-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল। চার দিনব্যাপী এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশীদের দ্বারা বন্য প্রাণীর পোচিং সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ পাচারের ওপর বি এস এফ আলোকপাত করবে। সেই সাথে থাকবে ভারত-বাংলা সীমান্তে কিছু এলাকায় কাঁটাতারের বেড়াসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বাংলাদেশীদের বেআইনীভাবে সীমান্তে চলাচল সহ ভারতের জমিতে বাংলাদেশীদের গবাদি পশু চরানোর বিষয়ে বি ডি আর-এর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হবে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

এছাড়া ২০১৩ সালের মধ্যে সীমান্তে পুরোপুরি কাঁটাতারের বেড়া লাগানোসহ ৫০০টি নতুন বর্ডার আউটপোস্ট গঠনের বিষয়ে ভারত যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় কাজ করবে।

এবারের নির্বাচনে জেতার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী মাসে ভারত সফরে আসবেন। তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা জঙ্গি বিরোধী কঠোর পদক্ষেপ ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে।

('দৈনিক সংবাদ'-এর সৌজন্যে)

অসমে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে

সংবাদদাতা ঃ যে সময়ে লক্ষ কোটি টাকার বিনিময়ে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির সফল রূপায়ণের জন্য ভারত আমেরিকা সহ পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর কাছে তোষামোদ করছে, সে সময় অসমে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারটি রয়েছে আপার অসমের একটি স্থানে। ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের এই খবর জঙ্গিদের কানে যাওয়ার আশঙ্কায় তথা দেশের নিরাপত্তাজনিত কারণে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসেবেই ওই স্থানটির নাম গোপন রাখা হয়েছে। দেশের প্রথম সারির রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও এন জি সি অসমে এই বৃহৎ ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে। কোম্পানির চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর এস শর্মা খোদ সংবাদ মাধ্যমের কাছে একথা ব্যক্ত করে বলেছেন, এ সম্পর্কে ও এন জি সি ইতিমধ্যেই ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াকে (ইউ সি আই এল) বিস্তারিতভাবে অবগত করিয়েছে। একই সঙ্গে আণবিক খনিজ বিভাগকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে শর্মা জানান। উল্লেখযোগ্য যে, এই মুহূর্তে দেশের শক্তি ক্ষেত্রে পরমাণু বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদার কথা উপলব্ধি করে ভারত আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি সই করেছে যদিও দেশে মজুত থাকা পরমাণু শক্তির ইন্ধনের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এমনকী যে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরমাণু ইন্ধন হিসেবে ইউরেনিয়াম আমদানি করতে চাইছে তার চেয়েও কম টাকা ব্যয়ে ভারত নিজের দেশে

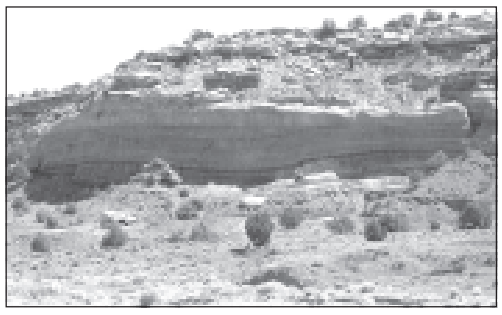

থাকা ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারে খননের কাজ চালাতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মন্তব্য করেছেন। ঠিক এ সময়ে অসমে এক বৃহৎ ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়াটা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত এই ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার করতে পারবে কি না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় আণবিক শক্তি বিভাগের ধারণা অনুযায়ী দেশের ভূগর্ভে এই মুহূর্তে প্রায় ৬১ হাজার টন ইউরেনিয়ামের মজুত ভাণ্ডার রয়েছে। পরমাণু শক্তি ভাণ্ডারের অধীনে দেশে থাকা এই ভাণ্ডার থেকে ইউরেনিয়াম আহরণের জন্য কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় আণবিক শক্তি বিভাগকে দু'শো কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। অন্যদিকে, ভারত সরকারের ইতিবাচক সাড়া পেলে আপার অসমে থাকা বৃহৎ ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের খনন কাজের জন্য ও এন জি সি-র সঙ্গে ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াও যৌথ উদ্যোগে কাজ করবে বলে ও এন জি সি-র চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী শর্মা সাংবাদিকদের জানান। উল্লেখযোগ্য যে, তেল ক্ষেত্রেই ও এন জি সি-র যাবতীয় অনুসন্ধান তথা আহরণের কাজ সীমাবদ্ধ। যদিও সম্প্রতি পরমাণু ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে কোম্পানিকে সরকার আণবিক ক্ষেত্রেও ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেদিক থেকে অসমে থাকা ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সন্ধান ও এন জি সি-র জন্য সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ সাফল্য হিসেবে গণ্য করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মেঘালয়ে কয়েক কেজি ইউরেনিয়াম সহ পাচারকারী ধরা পড়েছিল। সেজন্য সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে—এখবর উগ্রপন্থী ও পাচারকারীরা জেনে ফেলেছে কিনা! সেক্ষেত্রে কেন্দ্রকে কড়া সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

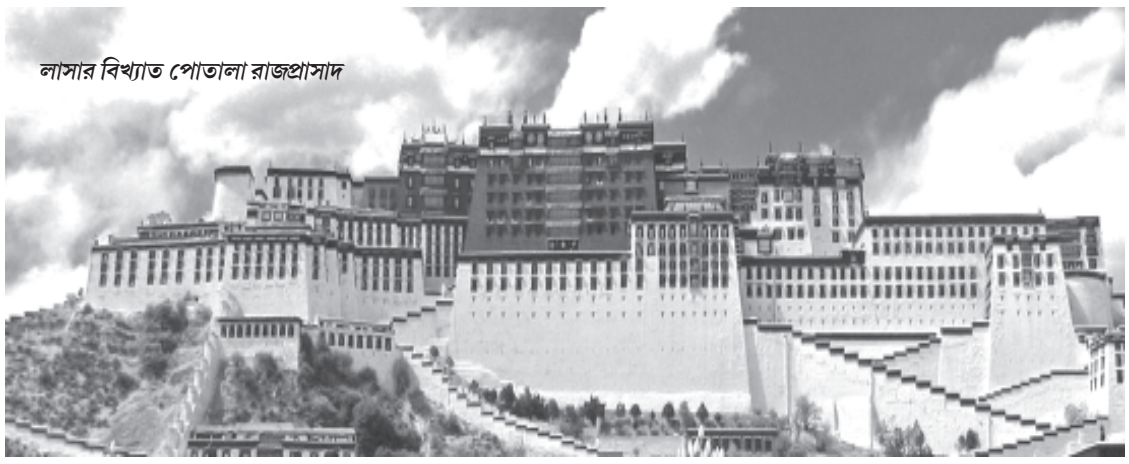

লাসার বিখ্যাত পোতালা রাজপ্রাসাদ

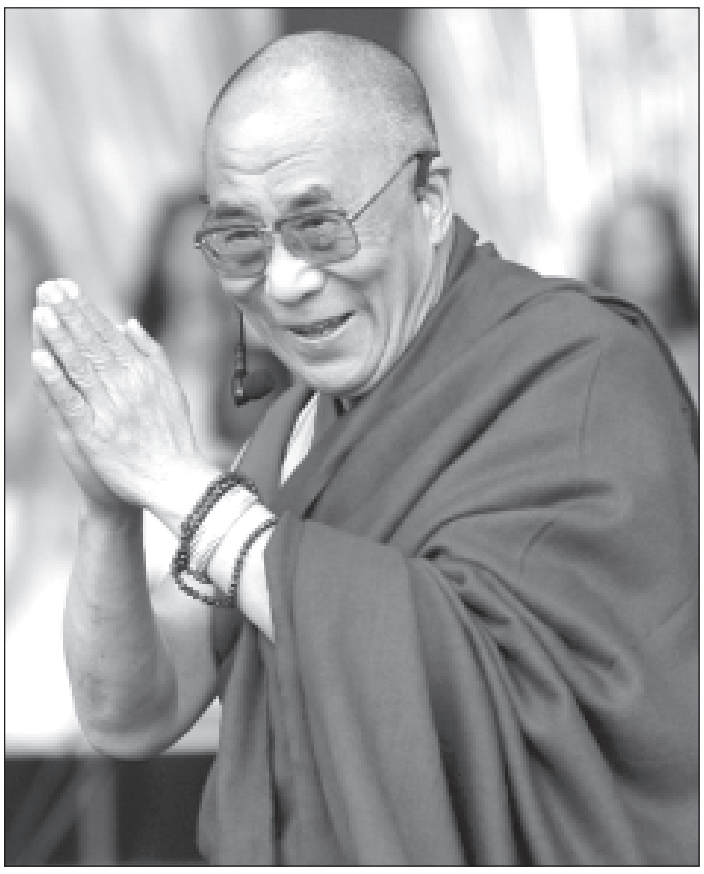

এক সময়ে তিববতই চীন শাসন করত

অরবিন্দ ঘোষ

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন অরুণাচল প্রদেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন চীন দারুণ বিরোধিতা করেছিল, চীনের ভাবখানা ছিল এমন; যেন অরুণাচল তাদেরই দেশের কোনও রাজ্য। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের শোচনীয় অবস্থাটি বারংবার ফুটে উঠেছিল। সেই দৃশ্যটা আদৌ কোনও ভারতীয়র কাছেই সুখকর ছিল না।

আমাদের দেশের সংবিধানকে উহ্য রেখেও একথা বলা চলে যে এই রাজ্যটি ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা প্রণব মুখোপাধ্যায়ও সাম্প্রতিকতম সময়ে কলকাতায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং দেশ চাইছে এই সরকার চীনকে চুপ করতে বলুক এবং তিববতকে চীন তাদের কবল থেকে মুক্ত করুক। আরও স্পষ্ট করে বললে, ভারত ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের দাবী করার সময় হয়েছে যে, তিববতকে আবার তার স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যেহেতু, তাদের ওপর চীন সরকারের পুরো সার্বভৌম কর্তৃত্ব কায়েম রয়েছে। যেজন্যে এই দেশটি বিনা আপত্তিতে সবকিছু মেনে নিয়ে একদা প্রতারিত হয়েছিল ১৯৪০-এর দশকের শেষভাগে এবং ১৯৫০-এর প্রথম ভাগে, চীন কিভাবে জোচ্চুরি করে এমনকী ভয়ংকর হত্যালীলা চালিয়ে তিববতের ওপর নিজের দখল কায়েম করেছিল তা বিশ্বস্তসূত্রে সংগৃহীত প্রামাণিক তথ্য সহযোগে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রকৃতপক্ষে তিববত একদা চীনের দ্বারা অধিগৃহীত হয়েছিল এবং এর রাজধানীকেও ধবংস ও লুণ্ঠনের শিকার হতে হয়েছিল।

এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক কিনা তা যাচাই করতে আমাদের হাতে গোটা দুই তিন নির্ভরযোগ্য সূত্র রয়েছে। প্রথমত, নেপালী পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ বালচন্দ্র শর্মার একটি বইয়ে দেখানো হয়েছে চীনের সংস্কৃতি কিভাবে নেপালে অনুপ্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়ত, ডঃ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল বিরচিত ‘ক্রোনলজি অ্যান্ড হিস্ট্রি অব্ নেপাল ফ্রম ৬০০ বিসি টু ৮৮০ এডি’ পুস্তকখানি। তৃতীয় সূত্র, লন্ডন টাইমস্-এর বিশেষ সংবাদদাতা পারসিভাল ল্যানডন যিনি ১৯০৩-০৪-এ স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংঘুসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে লাসায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় একজন সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা বই ‘লাসা- ভলিউম ১ এবং ২।’

সংক্ষেপে এই তিন লেখকের লেখাগুলির ওপর আলোচনা করব।

শ্রী শর্মা ১৯৫০-এর দশকে নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বের আলোকে আসেন এবং ১৯৬০-এর দশকে যখন তাঁর নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল চীনে যায় তখন তিনি দেখেন নেপালী ভাস্কর আর্নিকোর বহু স্থাপত্যকীর্তির তখনও ছিটেফোঁটা সেখানে অবশিষ্ট আছে। এই আর্নিকোই চীনা উচ্চারণে আনিকো, এরমধ্যে একটি হলো সন্ন্যাসী মঠ যেটা বেজিং-এর কাছে এখনও রয়েছে। পাঠকদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে কাঠমাণ্ডু-কোডারি হাইওয়ে, যেটা দিয়ে সরাসরি লাসা যাওয়া যায় সেটা চীন কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ১৯৬৪-৬৭ সাল নাগাদ। ওটিকেই নেপালে বলা হয় আর্নিকো রাজপথ।

‘ক্রোনলজি অ্যান্ড হিস্ট্রি অব্ নেপাল ফ্রম ৬০০ বিসি টু ৮৮০ এডি’ বইটির ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখবেন তাতে লেখা রয়েছে—তিয়াং ছবন্ত্রঙ্কষ্ণ-এর ইতিহাস। যাতে তিববতের সমকালীন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সেটা ১৮৮০ সালে প্রকাশিত রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একটি ক্রোড়পত্রে ৪৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় অনূদিত হয়েছিল পিকিং-এর এক ব্রিটিশ প্রতিনিধি ডাক্তার এস. ডব্লউ বুসেলের মাধ্যমে। এই অনুযায়ী, স্ট্রং-স্ট্যাণ্ড-গ্যাম্পো (চীনে যিনি সুৎ-সাঙ্-লুঙ্টসান) যিনি মারা যান ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর জায়গায় উত্তরাধিকারী করেন ৮ বছর বয়সী নাতিকে। যাঁর ছেলে চি-নু-শশিলাং নেপালের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে নিহত হন। তিনি ৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ৭ বছর বয়সী ছোট ছেলেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করতে সমর্থ হন। ৭৫৫-৭৫৬ পর্যন্তই নয় (দুটি উত্তরাধিকারের পরবর্তী পর্যায়ে) তিববতী রাজারা আরও একবার সেনাবাহিনীর বীরত্বে চীন আক্রমণ করেন এবং ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের রাজধানী পর্যন্ত দখল করে নেন।

সুতরাং তিয়াং-এর ইতিহাস বলছে একজন তিববতী রাজা চীন আক্রমণ করেছিলেন এবং এর রাজধানীও দখল করেছিলেন। এর সপক্ষে আরো দু'টো বই থেকে প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন পারসিভাল ল্যানডন, যিনি ঘটনাচক্রে নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের ওপর একটি পুস্তকের লেখক সেই তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন “বংশাবলী”।

ল্যাণ্ডনের প্রথম খণ্ডে তিববত চীনের সম্পর্ক নিয়ে বলা হয়েছে, জায়গার অভাবে সেটি সংক্ষেপিত করতে হচ্ছে—“এটি ইতিহাস জগতের বিখ্যাত ঘটনাগুলির একটা নয় এবং চীনের সঙ্গে ক্রমাগত শত্রুতায় হয়তো এই ঘটনাটি বাদ পড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে ‘শত্রুতা’ বলতে—শত্রুতা বা সমগোত্রীয় কিছু ধরতে হবে। এর ফলস্বরূপ চীনা সীমান্তে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। সেটি আর কিছু নয়, সকল অর্থে চীনের সন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল। ঘটনাবলীর ওপর তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে এমন ধারণাই হতে বাধ্য। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিববতের রাজা সুৎ-সান-গাম্পো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিয়াং-এর ইম্পিরিয়াল হাউসের এক রাণীর হাত থেকে, শাসকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে এবং কয়েক বছর যুদ্ধের পর...

স্ট্রং-সান গাম্পোর নাতি তি-স্ট্রং-ডি-স্ট্যাণ্ড চীনের সঙ্গে শত্রুতার পুনরারম্ভ করেছিলেন এবং ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে দখল করে নেন রাজধানী চাঙ্গাম বা এইচ সিয়া-ফু...

দ্বিতীয় খণ্ডে আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে কেমন করে চীন গ্রাস করেছিল তিববতকে। স্মরণ করা যেতে পারে, এই সুপরিচিত সাংবাদিক (পারসিভাল ল্যাণ্ডন) ফ্রান্সিস ইয়ংঘুসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে ১৯০৩-০৪ সালে ব্রিটিশের লাসা অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ল্যানডেন বলেছেন—“পুনরায় অভিযানের পূর্বে আমি গত কয়েক বছরের লাসার আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে একটি স্কেচ আঁকার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যেটা

আগের চাইতেও অনেক বেশি বিস্তারিত হবে।”

তিববতের এই পরিস্থিতি যেটা এখন খুব ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা থেকে মুক্ত হতে হলে চীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তিববতীদের সুচিন্তিত এবং দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। এই নীতিই বহু বছর ধরে চলে এসেছে। ৩৫ বছর পূর্বেই তিববতে স্বাধীনতার চেতনা জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে ছিল একটি অনুমোদিত উন্নতশীল রাজনৈতিক দল। যার নেতৃত্বে ছিলেন এমন একজন, যিনি মর্যাদার প্রশ্নে গাডেন বৌদ্ধ মঠের কোষাধ্যক্ষের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিলেন না। পুরনো রাজার আমলে, এটা সুপরিচিত যে শাসনতন্ত্রের একটা ধারাবাহিকতা ছিল, এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ ১৮ বছর বয়সে পৌঁছনোর পূর্বেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যুবক বড় লামাদের সমান্তরালভাবে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এটাই ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে শাসন করার ফলশ্রুতি এবং চীনের সার্বভৌমত্বকে নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণের ক্রমাগত সুযোগ দিয়ে যাওয়ার জন্য শেষপর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যাতে চীনারাজের অনুমোদন ব্যতীত কোন শাসকের মনোনয়ন অসম্ভব হয়ে উঠল।”

নির্বাচনে যেটা আজ পর্যন্ত খুব কমক্ষেত্রেই হয়েছে। যেখানে দলাই লামা নিজেই তত্ত্বগতভাবে অন্তত পিকিং-এর অনুমোদনের একটা বিষয়বস্তু ছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকারটুকু কদাচিৎ বা একদমই দেওয়া হোত না। তাঁর আয়ত্ত্বাধীন অঞ্চলের অন্যপ্রান্তে চীনা সম্রাটরা নিঃসন্দেহে তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতেন।

এই পর্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বরং দেখে নেওয়া যাক ল্যানডন এই নিয়ে আরও কি বলেছেন—“চীন তাদেরকে (তিববত) ব্যবহার করেনি ভারতের সঙ্গে বিবাদে (১৯০৩-০৪-এ ইয়ং- ঘুসব্যাণ্ডের অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত) এবং সেই মুহূর্তে দলাই লামাকে পুনরায় ‘রক্তমাংসের দেহে’ পরিণত হতে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। মানে চীনের প্রভাব খাটানোর প্রয়াসের সঙ্গে আশ্চর্যরকমের ভাবে সামঞ্জস্যহীন এমনকী দুর্ঘটনামূলক পর্যন্ত ছিল। বলা যায়, তাকেই পুনরায় সাধারণভাবে সুযোগসন্ধানী করে তোলা হলো। সুতরাং তিনি নিজের সম্মান বাঁচাতে তাই ধর্মীয় শিক্ষকের সম্মানটুকু নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। অস্থায়ী ক্ষমতাটুকু চলে গেল শাসনের হাতে। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব চুক্তি সাক্ষরিত হবার পর তিববতে শেষ চীনা অস্তিত্বের চিহ্ন হিসেবে ঝেড়ে ফেলা হলো একজন কাউপ ডি-ইতাতের দ্বারা ১৮০৫ সনে (চুক্তিটি হয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে যদি খুব একটা না ভুল করি।)”

এই তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে তিববতীরা কোনওদিন চীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি এবং একটি সার্বভৌম দেশকে জোর করে ধরে রেখে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে চীন। ভারত এবং সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের বলার সময় হয়েছে চীনকে তিববতের স্বায়ত্ত্ব শাসন ঘোষণা করতে হবে এবং নিজেদের ভাগ্য তিববতীদের ওপরই ছেড়ে দিতে হবে।

বাংলার মুসলমান ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

নবকুমার ভট্টাচার্য

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানেরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ওই যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে মুসলিম শাসনের অবসান হয়। এই সময় মুসলিম ছেলেদের মধ্যে কেবল কোরাণ শিক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষার বালাই ছিল না। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে তার আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে।

যেকোন কারণেই হোক এর পূর্বে এক শ্রেণীর মুসলমানের ধারণা ছিল যে, কোম্পানির শাসন ৫০ বছরের অধিক স্থায়ী হবে না। দেশে আবার মুসলিম শাসন ফিরে আসবে। এ ধারণা না মেলার ফলেই পরবর্তীকালে মুসলিমরা অন্য কৌশল অবলম্বন করে। অবশ্য সেই সময় বৃটিশ নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। মুসলমানের ক্ষোভ প্রশমনের জন্যে বৃটিশ সরকার দমন-পীড়ন হ্রাস করে অনুগ্রহ বিতরণের মাধ্যমে আনুগত্য আদায়ের নীতি গ্রহণ করে। বৃটিশ সরকারের মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম প্রমাণ হল 'অঞ্জুমান ই-ইসলামি' (১৮৫৫) নামে একটি সংগঠন। এটি সামাজিক সংগঠন হলেও সভা সম্মেলনে রাজনৈতিক মতামতও ব্যক্ত করেছে। সরকারের প্রতি আনুগত্যবশত সিপাহি বিদ্রোহ সমর্থন করেনি। মুসলমানেরা শিক্ষা ও রাজনীতি সম্পর্কে সরকারের কাছে নানা সময়ে নানা দাবী ও প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। ১৮৭০ সালে কলকাতায় একসভায় জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলি রাজনীতি বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ নয়;ইংরেজদের অধীনে থেকে নানা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। ১৮৭৮ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা অ্যাসোসিয়েশনের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়ে মুসলমানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে প্রস্তাব করে এবং সরকারের কাছে তা নিয়ে দরবার করে। অ্যাসোসিয়েশন এরূপ দাবী সম্বলিত ২৮টি অনুচ্ছেদে রচিত একটি দীর্ঘ স্মারকপত্র (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২) বড়লাট রিপনকে প্রদান করে। এতে মুসলিমদের শিক্ষা ও অধিকারের নানা দাবী ছিল।

এর পূর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার ২০ বছর আগে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। লক্ষ্য ছিল দেশের আদালতগুলির জন্য দক্ষ মুসলমান কর্মচারী তৈরি করা। অভিজাত মুসলমান শ্রেণী সেইসময় ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী জানালে সরকারি ব্যয়ে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আদালতে ফার্সি ভাষা চালু থাকায় মাদ্রাসায় আরবি ও ফার্সি শিক্ষা প্রাধান্য পায়। সেখানে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার স্থান ছিল না। মৌলভি মইজউদ্দিন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে মৌলানা আবদুর রহিম (১৮০৮-২৮), মৌলানা গিয়াসউদ্দিন (১৮২৮-৩৭) মৌলানা মোহম্মদ ওয়াজিহ (১৮৩৭), মৌলানা আবদুল হক (১৮৫৬-৭৫), মৌলানা আবদুল হাই (১৮৭৫-৯১), শামসুল মৌলানা আহমদ (১৮৯২-১৯১২) দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসার ব্যয়-নির্বাহের জন্য ১৭৮৫ সালে বার্ষিক ২৯ হাজার টাকা আয়ের একটি জমিদারি (মাদ্রাসা মহল) নির্দিষ্ট হয়। ১৭৯১ সালে মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য ব্যয় বাবদ সরকারি কোষাগার থেকে বার্ষিক নগদ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। মাদ্রাসায় কেবল মুসলমান ছাত্রেরা অধ্যয়ন করত। এখানে তাঁদের বেতন দিতে হোত না। অধিকন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রায় একশত ছাত্র পাঁচ, আট এবং দশ টাকা হিসেবে মাসিক বৃত্তি পেত। ১৮২৩ সালে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হবার পর মাদ্রাসা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮২৩ সালে সরকার মাদ্রাসার জন্য উপযুক্ত গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, এজন্য ১, ৪০, ৫৩৭ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮২৪ সালের ১৫ জুলাই নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কলকাতা মাদ্রাসার জন্য খরচ করেছিল ১২, ৩৮, ৪৭৯ টাকা। এই সময় বৃত্তি, পুস্তকদান প্রভৃতি নানা প্রকারে মাদ্রাসার ছাত্রদের উৎসাহিত করাতো ছিলই, অধিকন্তু আদালতের প্রধান বিচারপতির প্রতি নির্দেশ ছিল সরকারি কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হলে মাদ্রাসার কৃতী ছাত্রকেই যেন নিযুক্ত করা হয়। এই হিসেবে ১৮১৪ সালের রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে—ওই সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ১৬৭ জন দেশীয় শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে মুসলমান ছিলেন ১১৬ জন (৬৯.৫%) এবং অমুসলমান ৫৫ জন (৩০.৫%)। লর্ড মেকলের পরামর্শ অনুসারে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সিকে বাদ দিয়ে ইংরাজী চালু করলে মুসলমান সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। আবদুল লতিফ বলেন, অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানের শরাফত রক্ষার জন্য ফার্সি শিক্ষা আবশ্যক। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরা বাংলা শিখতে পারে, তবে সেই বাংলাকেও হতে হবে আরবি ফার্সি শব্দ মিশ্রিত বাংলা।

এদেশের মুসলমানরা প্রথম থেকেই ইংরেজি শিক্ষাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। স্বাধীনতার পর থেকে চারটি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমান সমাজে বর্তমান। এক, খারিজি মাদ্রাসা। যেখানে মূলত আরবী ও ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হয়। দুই, হাই মাদ্রাসা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় আরবিসহ মাধ্যমিকের সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা। তিন, সিনিয়ার মাদ্রাসা। সরকারি সৌজন্যে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা। চার প্রথাগত স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলমান সমাজ তাদের সন্তানদের কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াবে তা নিয়ে নিজেরাই প্রথম থেকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যদিও ইদানিংকালে স্কুলে যাওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এই বিষয়ে ২০০৭-০৮ সালের রিপোর্ট Elementary Education in India : Progress Towards Universal Elementary Education ২০০৭-০৮ শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের মাত্র ২৮.১৩ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। অথচ সাচার কমিটির রিপোর্ট বলছে এ রাজ্যে ৪ শতাংশ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী মাদ্রাসায় পড়ে। বাকি ৯৬ শতাংশ পড়ে প্রথাগত স্কুলে। তথ্যটি সঠিক নয় বলেই সাধারণের ধারণা।

এ রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মূল স্রোতের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষার দুটি বিভাজন। এক হাই মাদ্রাসা, দুই সিনিয়র মাদ্রাসা। হাই মাদ্রাসার আবার তিনটি স্তর—জুনিয়ার হাই, হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি। সিনিয়ার মাদ্রাসায় রয়েছে—আলিম, ফাজিল ও এম এম স্তর। এম এম স্তরকে বলা হয় মোমতাজ্জল মোহাদ্দেশিন পাঠ্যক্রম। এটি দু' বছরের এম এর সমতুল বলে দাবি করা হয়। খেয়াল করলে দেখা

(এরপর ৯ পাতায়)

মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি অনুদান টোলের ক্ষেত্রে উদাসীন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য নানা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা নিলেও, রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে রাজ্যের টোলগুলি আজ ধুঁকছে। স্কুল থেকে সংস্কৃত তুলে দেওয়ার ফলে টোলের সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। সরকারি দৃষ্টিতে টোলগুলি আজ হয়ে উঠেছে বাড়তি বোঝা। কুড়ি বছর কোনও নতুন অধ্যাপক তো দূরের কথা শূন্য পদগুলিতেও নিয়োগ বন্ধ করে টোলের সংখ্যা কমিয়ে আনা হচ্ছে। ১৯৮০ সালে যেখানে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত টোলের সংখ্যা ছিল ৯২০ বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে ৬৮৫টি।

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিশন টোলের মানোন্নয়নের সুপারিশ করেছেন বারবার। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী কমিশন, ডঃ ভবতোষ দত্ত কমিশন, ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের রিপোর্টে এ ধরনের সুপারিশ রয়েছে। সম্প্রতি টোল শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিশন নানা সুপারিশ করেছেন। রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশক্রমে টোলের পণ্ডিতদের অবসর গ্রহণ ৬৫ বছর বয়সে বাধ্যতামূলক হলেও, অবসরের পর তাঁদের পেনশন বা অন্য কোনও সাহায্যের ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। টোলের পণ্ডিতদের জন্য বেতনের কথা কেউ ভাবেনি। তবুও রাজ্যের প্রায় ৮৮৫ জন পণ্ডিত বিনাবেতনে যৎ সামান্য মহার্ঘ্যভাতা পেয়ে টোলগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পঞ্চম বেতন কমিশন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতনক্রম নির্ধারণ করলেও টোল পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েনি। কারণ টোল শিক্ষকদের পে-স্কেল নিয়ে কেউ ভাবেনি। টোল পণ্ডিতদের কোনও কার্যকর সংগঠন না থাকায় পণ্ডিতদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কোনও জোরালো আন্দোলনও হয়নি।

টোলের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সুবিধা পান না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে দফতরে নাম তুলতে গেলেও টোল উত্তীর্ণ ছাত্রদের সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হয় না। অথচ এই সার্টিফিকেট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগই দিয়ে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের অধীনে রয়েছে টোল শিক্ষা দফতর। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগের সময় টোল শিক্ষার জন্য বাড়তি কোনও যোগ্যতা ধরা হয় না। অথচ ১৯৬৪ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত ভারত সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে— কলকাতার বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের 'তীর্থ' উপাধি যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ডিগ্রির সমতুল্য।

টোল উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকরি তো দূরস্থান, গবেষণার কোনও সুযোগই নেই তাদের। পরীক্ষা ব্যবস্থাও গুরুত্বহীন। নিয়মিত পরীক্ষা ও সমাবর্তন হয় না। মেধাবৃত্তির জন্য গচ্ছিত অর্থের কোনও হদিস নেই। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র চলে যায় কোনও কোনও পণ্ডিতের হাতে। অভিযোগ উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে পৌরোহিত্য 'আদ্যর প্রশ্নপত্র' বিক্রি হয় পরীক্ষার পূর্বে। গত বছরই আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় উপাধি পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছিল। টোলে পড়াশোনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। উত্তর দেওয়ার কোনও দায় ও দায়িত্বও নেই। কারণ টোল পণ্ডিতদের নেতা সাজা কিছু ভুঁইফোড় দালাল শ্রেণীর মানুষ করে কম্মে খেয়ে বেশ সুখেই রয়েছেন, আর সরকার নিযুক্ত একটি অ্যাডহক কমিটি টিমটিম করে চালাচ্ছে টোল শিক্ষা দপ্তর-'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ।' গত তিরিশ বছর এই সংস্থায় কোনও গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়নি। বস্তুত বিগত ৩২ বছরে টোলের জন্য কোনও পরিকাঠামো তৈরি করেনি সরকার। উল্লেখ্য ২০০৫-০৬ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল চার কোটি টাকা আর ২০০৮ সালে সেই পরিমাণ বেড়ে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অথচ ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে টোলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা থেকে ৪ কোটি টাকার মধ্যে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমনের প্রভাব ভোটের বাক্সে পড়লেও টোলের ক্ষেত্রে তা অচল। তাই হয়তো সরকার উদাসীন।

অথচ প্রতিটি টোলের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা, লাইব্রেরির ব্যবস্থা, ছাত্রদের অনুদান ও ভবিষ্যৎ ভাবনা, পণ্ডিতদের কয়েক মাস অন্তর মহার্ঘ্য ভাতা নয়, উচ্চহারে বেতন এবং সর্বোপরি টোল শিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি।

বাম জমানায় মাদ্রাসা শিক্ষার রমরমা

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এ রাজ্যে ২.১১ কোটি (২৬.২৭ শতাংশ) সংখ্যালঘুর বসবাস। যার মধ্যে ২৫.২৫ শতাংশই মুসলমান। অর্থাৎ এরাজ্যের সংখ্যালঘুদের মধ্যেও ৯৬ শতাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের। একই সঙ্গে দেশের সর্বাধিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঘন জনবসতিপূর্ণ ৫০টি জেলার মধ্যে ১২টি জেলাই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

স্বাভাবিক ভাবেই এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার জন্য চাই যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ৩২ বছরের বাম জমানায় উন্নয়ন খরার কবলে এ রাজ্যের সব কিছু। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিন্তু রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা। গত বত্রিশ বছরে এ রাজ্যে কল-কারখানা-শিল্প সব কিছু হ্রাস পেলেও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা—মকতব। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন সময় অর্থ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। পরিসংখ্যান বলছে ১৯৭৭ সালে যেখানে মাদ্রাসার জন্য রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা সেখানে ২০০৯-১০ সালে বাজেট বরাদ্দ ৩২৫.০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চাৎপদ হিসাবে মুসলমানদের তুলে ধরে, তাদের পিছনে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করার নামে, মাদ্রাসাকে মুসলমান সেন্টিমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে, মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে কুক্ষিগত করার এক লাগাতার প্রচেষ্টা করে গেছে এ রাজ্যের সেকুলার বাম সরকার।

এ রাজ্যের বাম সরকার বারে বারে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার কথা বললেও তারা নিজেরাই এ ক্ষেত্রে বরাবর দ্বিচারিতা করে চলেছে। মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হল তাদের পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চাৎপদ মানসিকতা তথা পশ্চাৎপদ চিন্তা। আর এগুলি দূর হতে পারে কেবলমাত্র চৌদ্দশো বছরের জরাজীর্ণ শরিয়তি শিক্ষা অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে রাজ্যের মুসলমান শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে পারলে। কিন্তু রাজ্য সরকার ঠিক উল্টো কাজটি করছেন। এদের নীতি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

বর্তমানে রাজ্যে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৬০ টি। যার সব ব্যয়ভার বহন করে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে উচ্চ মাদ্রাসা ৮০৪টি, প্রাথমিক মাদ্রাসা ২৮০০ এবং হিফন মাদ্রাসা (অর্থাৎ যেখানে শুধু কোরাণ পড়ান হয়) ৩৫০টি। এগুলি সবই সরকারী স্বীকৃতিহীন। এই পরিসংখ্যান তিন বছর আগের। অর্থাৎ বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি সম্পর্কেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা ইতিবাচক।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ৩০০টি নতুন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন অনুমোদনের জন্য আরও অনেক আবেদন-পত্র জমা রয়েছে। এইসব মাদ্রাসার জন্য ২১০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে রাজ্য সরকার নতুন করে ১০০টি মাদ্রাসা স্থাপনের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে চলেছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ধাঁচে ৪০০ মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর জন্য ২৪০০ শিক্ষা সহায়ক ও ৮০০ শিক্ষাকর্মী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৪টি মাদ্রাসাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। যার জন্য ৩০০ শিক্ষক পদ ও ২০০ শিক্ষাকর্মীর পদ তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য বার্ষিক খরচ অতিরিক্ত ১৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার ১২৯টি জুনিয়র হাই মাদ্রাসাকে হাই মাদ্রাসায় উন্নীত করেছে। এর জন্য রাজ্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় হবে ৮ কোটি টাকা। এছাড়া ১১০টি মাদ্রাসায় ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য ১ কোটি টাকা, মাদ্রাসা গ্রন্থাগারের জন্য ৩.৫ কোটি টাকা, মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোষাকের জন্য ৩.৯১ কোটি টাকা, ২০০ মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে কম্পিউটার কোর্সের জন্য ১.২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার বর্তমান আর্থিক বর্ষে ব্যয় করছে।

রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ বাম সরকারের এহেন মাদ্রাসা প্রীতি সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে বিধানসভায় 'আলিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট' পাশ করিয়ে কলকাতা মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকেশনাল স্টাডিজে ২৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কোর্স ফি-র মাত্র ১০ শতাংশ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হয়। ৯০ শতাংশ অর্থই রাজ্য সরকারের ভর্তুকি। সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রাপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক ভাবে ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাঠগ্রহণ করতে হয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ২৯৭ জন শিক্ষকের পদ অনুমোদন করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার জন্য চলতি আর্থিক বর্ষে ৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন জেলাতে সরকারি ইসলামী কলেজ খোলা হবে। বর্তমানে কলকাতা মাদ্রাসার ভবনটি শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্ব ও আরবী পঠন-পাঠনের কেন্দ্র হিসাবেই ব্যবহার করা হবে। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে গোরাচাঁদ রোডে আরও ১৪৪ কাঠা জমি বায়না করার জন্য ১৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। যেখানে তৈরি হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস।

এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত যে বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়েছে তা দেখলে একটি বিশেষ বিষয় আমাদের নজরে আসে। তা হল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের সরকারিভাবে আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার। যেমন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল—মজলিশ-ই-মুন্তাজিমা;আচার্য— আমির-ই-জামিয়া; উপাচার্য— শেখ-ই-জামিয়া; রেজিষ্টার— মুসাজ্জিল প্রভৃতি। উত্তরপ্রদেশের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় একটি সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তান তৈরির সবরকম বৌদ্ধিক উপাদান একসময় এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সরবরাহ করা হয়েছিল। এমনকী ১৯৭৯ সালে ইসলামি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন 'সিমি'র জন্মও হয় এখানেই। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বঘোষিত রক্ষাকারী, আমাদের সংস্কৃতিবান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রথম আবেদন জানায়, এ রাজ্যে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার। ফলস্বরূপ উর্দু ভাষাভাষি উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা বর্তমানে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে খোলার কাজ শুরু হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০০৬ সালে তাঁর এক বক্তব্যে বলেছিলেন—'We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, *Particularly the Muslim minority,* are empowered to share equitably the fruits of development. These must have the first claim on resources. রাজ্যের বাম সরকার বর্তমানে কেন্দ্রের মনমোহন সিং সরকারের এই নীতিরই অনুসারী। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের করায়ত্ব করার জন্য জন্য এরা সব কিছুর সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও দাঁড়িপাল্লায় তুলতে পিছপা নয়। মাদ্রাসা বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই সন্ত্রাসবাদের আখড়া হিসাবে পরিচিত। সন্ত্রাসবাদের এ হেন আঁতুড়ঘর থেকে এ রাজ্যে প্রতি বছর ৬/৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বের হচ্ছে। দলীয় স্বার্থে এ রাজ্যের বাম সরকার চায় দেশবিরোধী, মধ্যযুগীয় এ হেন শিক্ষাতেই শিক্ষিত হোক এ রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা। উগ্র বামপন্থী মৌলবাদ আজ তাই নিজস্বার্থে মিশে গেছে ইসলামি মৌলবাদের মিশ্রণে। দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এ জাতীয় দেশ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ। যা এদেশকে ঠেলে দিচ্ছে আরও গভীর সমস্যার দিকে। রাজনীতি ব্যবসায়ীদের এই ধরনের অনৈতিক বিপজ্জনক খেলা অবিলম্বে বন্ধ না হলে দেশ নতুন করে বিভাজনের দিকে এগোবে।

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

বাংলার মুসলমান ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

(৮ পাতার পর)

যাবে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাদ্রাসার দশম শ্রেণী অর্থাৎ আলিম এর পাঠ্যক্রমে আকাশ-জমিন ফারাক। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দুটো পাঠ্যক্রমকে সমতুল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এর মধ্যে ইসলামি ও আরবি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি ও আরবিতে রয়েছে মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৩৫০ নম্বর আর ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং লাইফ সাইন্সে মাত্র ৫০ করে নম্বর। উচ্চমাধ্যমিক ফাজিল পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। মাদ্রাসার স্নাতক স্তরের নাম কামিল। এর পার্ট ওয়ান, টু এবং পার্ট থ্রি স্তর রয়েছে। পার্ট ওয়ানে উর্দু, পরিবেশবিদ্যা সহ ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ছাড়াও রয়েছে ইসলামিক হিস্ট্রি। মোট নম্বর ৪৫০, পার্ট টু-তে রয়েছে ইসলামিক স্টাডি, আরবি ও উর্দু। বাংলা, ইংরেজীর মধ্যে একটি বিষয়। মোট ৬০০ নম্বর। পার্ট থ্রিতে রয়েছে ৩০০ নম্বর।

১৯৭৬-৭৭ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫ লক্ষ টাকা আর ২০০৮-০৯ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৩১৯ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ সালের মাদ্রাসা শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দের হিসেবে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সল্ট লেকে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং ১০০টি হাই মাদ্রাসাকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমান্তরাল মূলস্রোতের বহমান শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ বিষয়ে কোনও সমীক্ষা চালানো হয়নি। মোল্লাতন্ত্রকে মদত দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। মাদ্রাসাকে শিক্ষার মূলস্রোতে আনার প্রয়োজন তাই আজও উপেক্ষিত।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মাদ্রাসা ছিল ২৩৮টি, ২০০৫-০৬ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০৮টিতে। বৈধ মাদ্রাসা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে কয়েক হাজার অবৈধ মাদ্রাসা। এই অবৈধ মাদ্রাসাগুলির বেশিরভাগ অবস্থান ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে। মুর্শিদাবাদের সীমান্ত সংলগ্ন ৯টি থানা এলাকায় স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ১১ হলেও আরও ৩১টি স্বীকৃতি বিহীন মাদ্রাসা রয়েছে। নদীয়া জেলায় সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ১৮ হলেও স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা রয়েছে ৮১টি। মালদা জেলায় সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা ৬৮ ও বেসরকারি ১৭২।

অভিযোগ সীমান্তের স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাগুলিতে বিদেশ থেকে আসছে রাশি রাশি টাকা। এই টাকা দিয়ে চলছে সুব্যবস্থিত জেহাদী শিক্ষা। ভোটের লোভে রাজনৈতিক দলগুলি এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না।

দশরথ ও তিন রানী

নন্দলাল ভট্টাচার্য 'রাজা দশরথ' বিষয়ক নিবন্ধে, (স্বস্তিকা, ২৬।১০।০৯) , বলেছেন—রাজা দশরথের ৩৫৩ জন স্ত্রী ছিল। তাঁদের মধ্যে কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজকন্যা;এবং প্রধানা মহিষী। বাদবাকি সাড়ে তিনশত জন ছিলেন শূদ্র ও বৈশ্য কন্যা;তাঁদের বলা হত যথাক্রমে 'পরিবৃত্তি' ও 'বারতা'। কিন্তু, রাজশেখর বসু 'বাল্মীকি-রামায়ণ-(সারানুবাদ) ' গ্রন্থে, (পৃঃ ১৫;টীকা-১), বলেছেন—শ্রৌতসূত্র অনুসারে রাজার প্রধানা পত্নী-মহিষী;উপেক্ষিতা পত্নী—পরিবৃত্তি;প্রিয়তমা পত্নী-বাবাতা;এবং অধমা পত্নী—অপরা বা পালাগলী। দেখা যাচ্ছে, রাজার পত্নীদের বংশভিত্তিক পরিচিত ছিল না; এবং রাজার প্রিয়তমা পত্নীকে 'বাবাতা' (নিবন্ধোক্ত বৈশ্যা স্ত্রী) বলা হোত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা দশরথের পত্নী-সংখ্যা বিষয়টি নিয়ে অমলেশ ভট্টাচার্য তাঁর 'রামায়ণ-কথা' গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৮-১৫২) আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত, কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা, দশরথের কেবল ওই তিনজন পত্নী ছিল। তাঁর বক্তব্য, মূলত রামায়ণের দু'টি শ্লোকের তথ্য নির্ভর করে আমরা ভুল ধারণা করে আসছি, দশরথের শত শত পত্নী ছিল।

চিঠিপত্র

বনগমনের আগে রাম দশরথের কাছে বিদায় নিতে গেলে, দশরথ সুমন্ত্রকে বলেছিলেন, তিনি সকল অন্তঃপুরিকা-পরিবৃত হয়ে রামকে দেখতে চান। তখন, "অর্ধসপ্তশতা" (অর্থাৎ সাড়ে-তিনশত) ধৃতব্রতা প্রমদা (রামের জন্য রোদন করে-করে) আরক্তচক্ষু হয়ে কৌশল্যাকে বেষ্টন করে রাজ-সকাশে উপস্থিত হলেন—"অর্ধসপ্তশতাসূত্র প্রমাদাস্তাম্রলোচনাঃ।।"—(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৪/১৩)। বিদায়গ্রহণের অন্তিমপর্বে রাম সেখানে উপস্থিত "ত্রয়ঃ শতশতার্ধা" (অর্থাৎ সাড়ে তিনশত) মাতৃগণকে দর্শন করেন—"ত্রয়ঃ শতমতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ।।"-(ঐ, ৩৯/৩৬)। উক্ত দুটি শ্লোকে দশরথের তথাকথিত শতশত পত্নীদের বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাঁদের সম্পর্কে কেবল বলা হয়েছে "প্রমদা" (৩৪/১৩), বিদ্যা গ্রহণের অন্তিমপর্বে রাম সেখানে উপস্থিত "ত্রয়ঃ শতশতার্ধা" (অর্থাৎ সাড়ে তিনশত) মাতৃগণকে দর্শন করেন—"ত্রয় শতমতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ।।"-(ঐ, ৩৯/৩৬)। উক্ত দুটি শ্লোকে দশরথের তথাকথিত শত শত পত্নীদের বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাঁদের সম্পর্কে কেবল বলা হয়েছে "প্রমদা" (৩৪/১৩), 'মাতরঃ' (৩৯/৩৬) ; তাঁরা কৌশল্যাকে স্থির সান্ত্বনা দিতে দিতে ("কৌশল্যাং পরিবার্যায়") আসছেন। এবং তাঁরা দশরথের অনুগৃহীতা অন্তঃপুরের বরাঙ্গনাবৃন্দ। তাই, রামচন্দ্র তাঁদের মাতৃবৎ মনে করেন—"মাতৃবদ্‌বর্ততে"—(ঐ, ১১৮/৬)।

অমলেশ ভট্টাচার্য মনে করেন, রাজা দশরথের শত শত পত্নীত্বের অপবাদটা আসলে রামায়ণ পাঠে আমাদের অজ্ঞানতা এবং ভুল অর্থবোধের উপর গড়ে উঠেছে। উদাহরণ, সুমন্ত্র রাজার আজ্ঞায় পুরস্ত্রীদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন—"প্রিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া"-(ঐ, ৩৪/১২)। তিনি বলেছেন, এখানে স্ত্রী শব্দের বহুবচন দেখে আমরা যদি ধারণা করি দশরথের শত শত স্ত্রী ছিল, তাহলে ভুল করা হবে। "স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ" বলতে সাধারণ অর্থে 'রমণীগণ'ই বুঝতে হবে। যেমন, মন্থরা কৈকেয়ীকে বলছে, "হন্তা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ"-(ঐ, ৮/১২)। এখানে "রামস্য স্ত্রিয়ঃ" শব্দের বহুবচন দেখে আমরা যদি ধারণা করি, রামচন্দ্রের বহু স্ত্রী ছিল, তাহলে ভুল হবে। বিখ্যাত টীকাকার তিলকও বলেছেন, 'সীতা ও সীতার সখীগণ' অর্থেই বহুবচনে "স্ত্রিয়ঃ" শব্দ ব্যবহার হয়েছে—"বহুবচনেন সীতা সখ্যঃ"। অর্থাৎ, মন্থরা বলতে চেয়েছে, রাম যদি রাজা হয় তাহলে সীতা ও তাঁর সখীদেরই আনন্দ। আলোচনার উপসংহারে অমলেশবাবুর মন্তব্য—ব্যাকরণের ভুত এমনি করে অনেক সময় অর্থবোধে বিপত্তি ঘটায়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। নিবন্ধে বলা হয়েছে, দশরথের ৩৫৩ স্ত্রী ছিল। সংখ্যাটা ৩৫২ হওয়া উচিত, যদি ধরে নেওয়া হয়, কৌশল্যাকে ঘিরে থাকা ৩৫০ জন শোকাতুরা পুরস্ত্রী সবাই দশরথের স্ত্রী। কারণ, তাদের মধ্যে সুমিত্রা ছিল, বলা বাহুল্য, কৈকেয়ী ছিল না। কাজেই, কৈকেয়ী ও কৌশল্যাকে ধরে হিসাব করলে দশরথের স্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৩৫২।

নিবন্ধকারের বিচারে দশরথ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কিন্তু অসংযমী নন। কথাটিতে অসঙ্গতি রয়েছে। গুণনির্দেশক শব্দ দুটি সমার্থক। 'অসংযমী' শব্দটির অভিধানগত অর্থ-রিপুপরবশ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অবশ্য আমাদের অনেকের ধারণা, রাজা দশরথ স্ত্রৈণ ছিলেন। তাই, কৈকেয়ীকে প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য তাঁর ছিল না। 'রামায়ণ' কিন্তু তা বলে না।

দেবাসুরের যুদ্ধে আহত রাজা দশরথকে কৈকেয়ী অক্লান্ত সেবাযত্নে সুস্থ করে তুললে দশরথ তাকে নিঃশর্ত বর দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় করা ধর্মনিষ্ঠ দশরথের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন এবং সেই সাথে কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—'...পাপিয়সি! আমি অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্রসংস্কারপূর্বক। তার পাণিগ্রহণ করেছিলাম, এখন তোকে আমি পরিত্যাগ করলাম।... যদি ভরত রাজত্ব পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। তাহলে সে যেন আমার শ্রাদ্ধ না করে।

আমার আত্মা তার দানপিণ্ড গ্রহণ করবে না।'—(ঐ, ১৪/১৪;৪২/৬-৯)। কথাগুলি কোন কামুকের কোন স্ত্রৈণের কণ্ঠ-নিঃসৃত হতে পারে না।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

হাস্যকর অভিযোগ
তালিবানকে সাহায্য করছে ভারত!

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী রেহমান মালিক সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছেন—আফগানিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে খাঁটি গেড়ে থাকা তালিবানকে ভারত আর্থিক সাহায্যও মদত জুগিয়ে পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছড়াচ্ছে।

পাকমন্ত্রীর অভিযোগকে অতঃপর কী বলা যায়? উলটপুরাণ, নাকি চোরের মা'র বড় গলা? ভারত করছে তালিবানকে সাহায্য! কোন উন্মাদ ভিন্ন এহেন অভিযোগ কোন সুস্থ মানুষ করতে পারে কিনা সন্দেহ। মালিকের তাই মস্তিষ্ক বিকৃতির চিকিৎসার আশু প্রয়োজন। মালিক ইসলামাবাদে বসে এ অভিযোগ না করে যদি ঢাকায় বসে করতেন তবে তাঁকে শুনতে হত—বক্তা আস্তে ক'ন, ঘোড়ায় হাইসবো (কত্তা আস্তে বলুন, ঘোড়া হাসবে)।

তামাম দুনিয়ার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ জানেন—তালিবান আমেরিকা ও পাকিস্তানেরই সৃষ্টি। ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগে সোভিয়েতপন্থী আফগান সরকার ও আফগানিস্তানে অবস্থানরত সোভিয়েত সেনাদের হঠাতে আমেরিকা সৃষ্টি করেছিল উগ্র ইসলামপন্থী তালিবান ও এক ইসলামি উগ্রবাদী ওসামা বিল লাদেনকে। এদের সৃষ্ট সশস্ত্র জঙ্গি এবং পাক-মার্কিন সেনার যৌথ আক্রমণে হয়েছিল আফগান সরকারের পতন ও সোভিয়েত সেনা নিধন। পাক-মার্কিন সমর্থনে তালিবান দখল করেছিল আফগানিস্তানের ক্ষমতা।

কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর তালিবান হয়ে ওঠে 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। তারা সেদেশে চালু করে কট্টর ইসলামিক শাসন। বাধ সাধে আমেরিকা। কিন্তু সমর্থন জানায় তালিবানকে। আফগানিস্তানকে তালিবান-মুক্ত করতে মার্কিন বিমানবাহিনী চালায় বিমান হানা—কার্পেট বোম্বিং। পতন ঘটে তালিবান সরকারের। পরাজিত তালিবান ও আল কায়েদা (লাদেন সৃষ্ট জঙ্গি সংগঠন) -র জঙ্গিরা পালিয়ে আশ্রয় নেয় পাকিস্তানে। লাদেনও গোপনে পালিয়ে আসে পাকিস্তানে। তালিবান ও লাদেনকে পাকিস্তানে ঠাঁই দেওয়া হয় এই শর্তে যে তালিবান ও আল কায়েদার জঙ্গিরা পাক মদতপুষ্ট ও প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতে নাশকতা ও অন্তর্ঘাত চালাবে। শর্ত মেনে ওইসব জঙ্গিরা ভারতে প্রায় এক দশক ধরে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে আসছে। এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

পাক মদতপুষ্ট ও প্রশিক্ষিত জঙ্গিরাই যে ভারতের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করতে সক্রিয় সে কথা বারবার ভারত আমেরিকার কানে তুললেও সে কথায় সে আমল দেয়নি। কিন্তু ৯/১১ ও ২৬/১১-র কাণ্ডের পর এবং সন্ত্রাসের বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ হাতে আসায় টনক নড়ে তার। আমেরিকা জঙ্গি দমনে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এমনকী, জঙ্গি দমনে আর্থিক সাহায্যেরও আশ্বাস দেয় সে। একদিকে চাপ ও অন্যদিকে আর্থিক সাহায্য—এই শাস্তি ও পুরস্কার পাকিস্তানকে বাধ্য করে জঙ্গি দমনে। জঙ্গি দমনের ঘোষণা হতেই তালিবান জঙ্গিরা পাকিস্তান জুড়ে শুরু করে তাণ্ডব। তারা প্রতিদিনই ঘটাতে থাকে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। ফলে পাকিস্তান এখন রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। মানুষ মরছে কাতারে কাতারে। তাই তালিবান আজ পাকিস্তানের কাছে ব্যুমেরাং। তালিবানেরও শত্রু পাকিস্তান। এ যেন ঘরের শত্রু বিভীষণ।

আফগান সীমান্তের লাগোয়া পাক ভূখণ্ড ওয়াজিরিস্তানে তালিবান ও আল কায়েদার জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। পাকিস্তানই একদা এদের এখানে আশ্রয় দিয়েছিল আফগানিস্তানে হামলা চালানোর জন্য। কিন্তু বর্তমানে তারা এতটাই শক্তি সঞ্চয় করেছে যে তাদের সঙ্গে পাক সামরিক বাহিনী এঁটে উঠতে পারছেনা। এখন পাক-মার্কিন যৌথবাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছে সেখানে। প্রত্যুত্তর দিচ্ছে তারাও। তবুও কোন অজ্ঞাত কারণে পাক সেনারা তাদের উপর চালাচ্ছেন জোরদার আক্রমণ। এমনকী, জঙ্গি দমনের টাকা ইতিপূর্বে ভারতে সন্ত্রাস চালানোর কাজে পাকিস্তান খরচ করেছে বলে আমেরিকা জানতে পেরেছে। সম্প্রতি গদিচ্যুত পাক রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশারফ সে কথা স্বীকারও করেছেন। আর তাতেই পাকিস্তানের সন্ত্রাস দমনের সদিচ্ছা নিয়েই সন্দিহান সারা বিশ্ব। ইতিপূর্বে পাকিস্তানে যত সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে তার জন্য পাকিস্তান ভারতের দিকেই আঙুল তুলেছে। কিন্তু কোন তথ্য-প্রমাণ আজও সে দিতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন। কারণ ভারত সন্ত্রাস বিরোধী। তাই সন্ত্রাসে সে মদত যোগায় না। আর পাকিস্তান হচ্ছে সন্ত্রাসের মদতদাতা। পাকিস্তানই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের জন্মদাতা। তাই নিজেদের পাপ ঢাকতে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই পাকমন্ত্রীর এই হাস্যকর অভিযোগ।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া

"বন্দেমাতরম্ বনাম ইসলাম"

সংবাদে প্রকাশ মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্থা দেওবন্দে তাদের ত্রিশতম সাধারণ অধিবেশনে জমিয়ত উলেমা এ-হিন্দ ফতোয়া দিয়েছে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' ইসলাম বিরোধী। অতএব মুসলমানরা এই গান গাইতে অপরাগ, এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছুই নেই। দেওবন্দ-এর নেতারা একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? ইসলাম ধর্মমতে ফটো তোলা নিষিদ্ধ কারণ যে ঘরে ফটো থাকে সেই ঘরে ফেরেস্তারা (দেবদূত) আসে না। অতএব, মুসলমানদের ভোট দেওয়ার আই-কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং পাসপোর্ট করা উচিত নয়, কারণ এইসব ক্ষেত্রে ফটো বাধ্যতামূলক, ইসলাম ধর্ম মতে সুদ খাওয়া হারাম। এখন দেখছি মুসলমান ইমাম, মৌলবী মৌলানা থেকে আরম্ভ করে গোঁফ ছাঁটা, লম্বালম্বা দাঁড়িওয়ালা সব পহরেজকার মুসলমানই (কাবুলীওয়ালারাও মুসলমান) ব্যাঙ্ক পোস্ট-অফিসে টাকা রেখে সুদ খাচ্ছে। এইসব কাজ কি ইসলাম বিরোধী নয়? তাছাড়া চুরি করলে ইসলাম ধর্মমতে হাত কেটে দেওয়ার বিধান দেওয়া আছে। কোন মুসলমান মেয়ে ধর্ষিতা হলে চারজন পুরুষ সাক্ষী যোগাড় করতে হবে অন্যথায় পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারের অভিযোগে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার বিধান দেওয়া আছে। তাহলে ইসলাম ধর্মগুরুরা পুরো শরিয়তি আইন চালু করার জন্য আন্দোলন করছেন না কেন? তারা গাছেরও খাবে তলারও কুড়াবে—এটা হতে পারে না, বন্দেমাতরম্ যদি ইসলাম বিরোধী হয় তবে পুরো শরিয়তি ফৌজদারি আইনও তাদেরকে মানতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪

"বন্দে চিদাম্বরম্"

দেবপ্রসাদ সরকার

বিশ্বের যাবতীয় অশান্তির মূলে এক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কাজ করছে। তাই ওই সংগঠনটি প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল কে জানে? এর পর হয়তো কোনওদিন

জনমত

চিদাম্বরমের মতে ওই প্রকার প্রগতিশীলই হোক আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোক, তারা যদি 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা' গানটি গাইতে অস্বীকার করে, তাহলে মনে হয় বর্তমানের কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউ পি এ সরকার তাও মেনে নেবে। কারণ, ভারতে বসবাসকারী কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্থানকে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে মানতে চাইবে না এবং সভা করে চিদাম্বরমের মতো কোনও নপুংসককে প্রধান অতিথি করে তার সামনে বলে বসবে ওই গানটি ইসলাম বিরোধী এবং তা কোনও সংখ্যালঘুর গাওয়া উচিত নয়।

চিদাম্বরম্ বাবরি নিয়ে কুম্ভিরাশ্রু মোচন করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা যাদের মূলমন্ত্র তাদের স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করেছেন। অথচ এই 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া নিষেধ ফতোয়া নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ভোটের স্বার্থে কোনও একটি সম্প্রদায়কে তোল্লা দেওয়ার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। চিদাম্বরমের জানা উচিত, বিশ্বের বেশিরভাগ জঙ্গি সংগঠন এই প্রকার সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত।

সকলকে রাজার পার্টে (অভিনয়) মানায় না, তাই ইউ পি এ সরকারের উচিত অবিলম্বে ওই প্রকার নপুংসকের ন্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বদল করে দেশের স্বার্থে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে দেশের বিভাজন রুখতে সকল দলের নেতা-মন্ত্রীর উচিত কর্তব্য। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে যে, সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি বা প্রশ্রয় দিতে হয়, এটা এই কংগ্রেসের কাছেই জানা গেল।

'বন্দেমাতরম্ গাইতে নিষেধ মুসলিম সংগঠনের'— এই বিতর্কমূলক ও দেশদ্রোহী মার্কা বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। দেশের স্বার্থ, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংঘবদ্ধ তাকে সরাসরি দেশদ্রোহীর মতো বক্তব্য সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' দেখে মনে হতেই পারে, ইউ পি এ সরকার তথা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভোটের স্বার্থে নপুংসকের মতো দেশকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করতেও মনে হয় দ্বিধা করবে না। দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল নির্বাচন ও ব্লক-ভোটের স্বার্থে সংখ্যালঘু বলে পরিচিত একটা সম্প্রদায়কে দিনের পর দিন তোল্লা দিয়ে যাচ্ছে। কি কর্মক্ষেত্রে, কি ধর্মক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, তাতে করে বাকিরা হয়তো একদিন সত্যিই সংখ্যালঘু জাতি হিসাবে পরিগণিত হবে। আশার একটাই আলো, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক নস্ত্রারদামুঁ বলে গেছেন, পৃথিবীর বিশেষ এক জাতি নিজেদের মধ্যে বিবাদে ধ্বংস হয়ে যাবে। কবে দার্শনিকের এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তব হবে কে জানে?

এখন জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ বন্দেমাতরম্ নামক ঐতিহ্যবাহী জাতীয় সঙ্গীতকে বলছে ইসলাম বিরোধী। 'মাতরম্' নামক শব্দটি নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ। সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিদাম্বরম্ সাহেব আবার সংগঠনের স্বদেশপ্রেম ও প্রগতিশীল মনোভাবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

পরম্পরা

ঈশ্বর পুরুষের রঙ্গরস

ঠাকুর শ্রীশ্রী নিগমানন্দ মহারাজ

বৈদেহীনন্দন রায়

নবরস—শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, বীভৎস, বাৎসল্য, শান্ত, হাস্য-নিয়েই মানুষের মানসিক কাঠামো। মনুষ্য মনের সংবেদনশীলতা এদের ঘিরেই। প্রতিদিনের হাসি-কান্না, আনন্দ, বেদনা, ভয়, স্থৈর্য্যর নিয়ামক এরাই। সাধারণ মানুষ তো রয়েছে, স্থিতপ্রজ্ঞ, পাশমুক্ত ঈশ্বরপুরুষরাও পারেন না এড়িয়ে যেতে নবরসকে। তাদের ভূমিকা সেখানে লীলাসঙ্গী। সর্বসাধারণের চেতনাকে চাগিয়ে দেন তাঁরা সহজবোধ্য শ্লেষাত্মক হাস্যরসে। সে হাস্যরসে থাকে প্রজ্ঞার দীপ্তি, সত্যের গাম্ভীর্য আর জীবনের বাস্তবতা। তাঁদের রঙ্গরস মোহ আবরিত মানুষের মোহান্ধকার মোচনে। ঈশ্বর পুরুষদের রঙ্গ-রসিকতা নিয়ে এই প্রতিবেদন।

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৫ কার্তিক। ঠাকুর নিগমানন্দদেব বগুড়ার আশ্রমে। শিষ্য ভক্তদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—দেখ, বুড়ো হয়ে মরা ভাল। এতে অনেক অভিজ্ঞতা হয়। যৌবন সংগ্রহের সময়। বৃদ্ধাবস্থায় ফলভোগ। বুড়োদের যুবকদের প্রতি একটা ঈর্ষাভাব দেখা যায়। যুবকদের প্রাণখোলা আচার-আচরণ বৃদ্ধে র কাছে অসহ্য। আর সব বুড়োই সেকালের প্রশংসা করতে খুব ব্যস্ত। তাদের আমলে যা ছিল—এ আমলে ওসব কিছুই নেই। সুখটাকে ভোগ করতে পারে না বলে, বুড়োরা মনে করে জগত থেকে সুখ বুঝি চলে
গেছে।

১২ পৌষ। সারস্বত মঠে ভক্ত সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিন। শুরু হয়েছে ঠাকুর নিগমানন্দের অমৃতবার্তা। কথাপ্রসঙ্গে বললেন রসময় দীপ্তিতে—তোমরা চাইতে জান না। তোমাদের চাওয়ার দায়ে ভগবান একেবারে অতিষ্ঠ। এখন এটা চাই। পরক্ষণেই ওটা চাই। এমনি করে ভগবানের দরবারে অনেক চাওয়ার দরখাস্ত ফাইল হয়ে আছে। ভগবান সবগুলিই

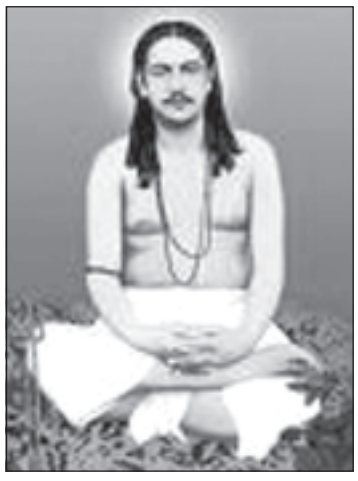

পূরণ করে যাচ্ছেন। কোন প্রার্থনাই বরবাদ হচ্ছে না। আজ হয়ত যেটা চাচ্ছ, আজই যে পাবে তার কোন মানে নেই। এর পূর্বে যেসব প্রার্থনা করে রেখেছো, সেগুলি পূরণ হয়ে গেলে পর তবে আজকের প্রার্থনা পূরণ হবে। যেমন ধরো— ভয় শীতকালে একজনের একখানা কম্বলের প্রয়োজন। সে শীতে কষ্ট পাচ্ছে। রাজ দরবারে একটা কম্বলের দরখাস্ত পেশ করল। এই দরখাস্তের আগে তার আরও অনেক চাওয়ার দরখাস্ত রাজ দরবারে জমা হয়ে আছে। সেখানে নিয়ম, আগের আগের দরখাস্ত মঞ্জুর করে পরের গুলি পরের জন্য মুলতুবী রেখে দেওয়া। এক্ষেত্রে হলো তাই। আগের প্রার্থনা মঞ্জুরের পর শেষের পালা যখন পড়ল তখন ভীষণ গ্রীষ্ম। এই গ্রীষ্মের মধ্যে তার ঘাড়ে পড়ল কম্বলের চাপ।

অন্য আর একদিন। প্রসঙ্গ উঠল জীবে দয়া নিয়ে। ঠাকুর বললেন—দয়া বললে অহঙ্কার আসে। দয়াটা সকলকে করা যায় না। কিন্তু সেবা রাজা-প্রজা উচ্চনীচ সকলের করা যায়। জীবকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করলেই
চিত্তশুদ্ধি হয় জেনো। একটা কাহিনী বলি।

একদিন আশি বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এল এক ঋষির কুটিরে। তিনি বনে কুটির বেঁধে আছেন। ঋষি তাঁর খাবার যোগাড় করে দিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ। তাই তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের কোশাকুশি-জল এসবও ঠিক করে রাখলেন। ভাবলেন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করে নিশ্চয়ই খাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তো সন্ধ্যাহ্নিক না করেই খেতে বসল। দেখে ঋষি খুব চটে গেলেন। বললেন—তুমি তো দেখছি অব্রাহ্মণ। সন্ধ্যাহ্নিক না করেই খাও। তোমার ব্যবহার তো অতি কদর্য।

শুনে ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ হয়ে আহার না করেই ঋষির কুটির ত্যাগ করে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ অভুক্ত অবস্থায় চলে যেতেই ভগবান এসে ঋষিকে বললেন—তুমি ওকে কেন দূর করে দিলে? ঋষি বললেন—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে সন্ধ্যাহ্নিক না করেই খেতে চেয়েছিল, তাই।

ভগবান বললেন—ওঃ, এতেই তুমি ক্ষুব্ধ? দূর করে দিলে অনাহারী ব্রাহ্মণকে। আমি যে ওকে ওরকম দেখেও ৮০ বছর ধরে খাবার যুগিয়ে আসছি। আর তুমি এ কারণে একবেলার খাবারটাও দিতে পারলে না। তাড়িয়ে দিলে?

সূত্র-শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবন ও বাণী।

পরমানন্দের উৎস পবিত্রতা

চৈতালি চন্দ

আজকের মানুষের জীবনে ধনদৌলত ঐশ্বর্য কোন কিছুরই অভাব নেই তবুও কি তারা সুখী? কখনই নয়। কারণ মানুষের চাহিদার শেষ নেই। একটি পূরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটির জন্য সে উদভ্রান্ত হয়ে ছোটে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা চাহিদা তার সামনে থাকে এবং তা পূরণ না হলেই সে কষ্ট পায়। প্রথমত, স্কুলে ভর্তি হতে হয়। স্কুল জীবন শেষ হবার পর সে ভাবে ভাল কলেজে সুযোগ পাবো তো? কলেজে ভর্তি হয়ে পাশও করে গেল তারপর চাকরী দরকার, চাকরীও পেল। তারপর সংসার জীবন শুরু হল। ২-৪ বছর পর মন খারাপ। সন্তান নেই। যাই হোক সন্তানও হলো। এরপর সন্তান নিয়ে ব্যস্ততা। সে বড় হল পড়াশুনো শেষ করল তারও বিয়ে হয়ে গেল সন্তান হলে-কর্তব্য শেষ। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সে যখন হিসাব কষে সে কি তখন বলতে পারবে "আমি সব পেয়েছি জীবনে আমি খুব সুখী"?

এখানেই বড় প্রশ্ন যে আমরা সব কিছু পেয়েও সুখী নই কারণ আমাদের চাহিদা প্রচুর।

কিন্তু কুমার-কুমারী যারা পবিত্র জীবন কাটাচ্ছে তারা সত্যিই আনন্দ অনুভব করছে। হয়তো কোনও কোনও সময় তাদের মনে হতে পারে তারা একা, কিন্তু একসময় তো মানুষকে একা হতেই হয়। বিবাহিত জীবনে দুজনে তো একসঙ্গে দেহত্যাগ করে না। তাই কখনও যদি কুমার-কুমারীদের মনে একাকীত্বের ভাবনা আসে তাদের প্রতি বক্তব্য— তারা একান্তে নিভৃতে ঈশ্বরসান্নিধ্য অনুভব করুক। কোন মোহ নেই-আসক্তি যেন না থাকে। পরমেশ্বরকেই জীবনসঙ্গী, বন্ধু শিক্ষক বানিয়ে তার কাছে সমর্পিত হও। সংসার মানেই ঝামেলা সংসার মানেই সংগ্রাম। যেখানে পবিত্রতা সেখানে শান্তি। পবিত্রতা এক বড় সম্পদ। এই পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য আত্মারূপী Battery কে Charge দেওয়া দরকার। এজন্য Power House (God) এর সঙ্গে মনের তার যুক্ত করতে হবে। যাদের মধ্যে পবিত্রতার শক্তি আছে তারাই ঈশ্বরের প্রিয় হন। এজন্য বলা হয় "পবিত্রতা সুখ শান্তির জননী"।

পবিত্রতাকে শক্তিশালী করার জন্য মনের ভাবনা শুদ্ধ করতে হবে স্বপ্নেও অশুদ্ধ ভাবনা আনলে চলবেনা। ধরা যাক খুব সুন্দরী এক মেয়েকে দেখে কোন যুবকের মন তার দিকে চলে গেল, তার মনে এল অশুদ্ধ বিচার। অশুদ্ধ সংকল্প আসতে শুরু করল, কিভাবে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে? ভাবতে হবে এই সৌন্দর্য্য কতদিনের? আজ আছে কাল থাকবে না শরীর তো নশ্বর, চোখ, কান, নাক সব কিছুর ভেতরেই আছে ময়লা। আত্মা ছাড়া যদি আমরা শরীর কল্পনা করি তাহলে সে তো শবদেহ (dead body)। শশ্মানে গেলে এটা আরও ভালো অনুভূত হবে। বরং পবিত্রতাতেই আনন্দ আজকের দুনিয়ায় আমাদের সকলের কাছে অনেক কিছুই আছে কিন্তু আসল সম্পদ পবিত্রতার বড় অভাব। তাই পবিত্রতা বজায় রেখে জীবনের আনন্দ অনুভব করতে হবে। জীবনের আসল আনন্দ আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি। পবিত্রতা আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান। আমরা জানি পবিত্র জিনিসকেই পূজো করা হয়। সন্ন্যাসীর সামনে আমরা মাথা নত করি কারণ তিনি পবিত্র। পদ্মফুল আমাদের জাতীয় ফুল হিসাবে স্বীকৃত। পাঁকে তার জন্ম অথচ পাঁক সে গায়ে লাগায় না তাই সে পবিত্র। ময়ূর আমাদের জাতীয় পাখী কারণ ময়ূর অত্যন্ত পবিত্র। শোনা যায় সত্যযুগে যাদের জন্ম হয়েছিল তারা সকলেই পবিত্র—কারণ ভোগে তাদের জন্ম নয়, তাদের জন্ম যোগে, পবিত্রতা মানে মন, বচন, কর্ম ও বাক্যে পবিত্রতা। কুমার- কুমারীরাই পারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে। কাম মহাশত্রু। কাম আত্মার পবিত্রতা নষ্ট করে ও জীবনে আনে দুঃখ। ফুলের বাগিচায় গেলে যেমন সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ অনুভব করা যায় তেমনি চরিত্রবান মানুষের সান্নিধ্যে এলে পবিত্রতার সুগন্ধ অনুভূত হয়।

তাই একমাত্র পবিত্রতার বলে অপরের প্রতি শুভ ভাবনা, শুভ সংকল্পের প্রকম্পন (Vibration) দিতে পারা যায়। তাই ঘরে বসেও ২০০০ মাইল দূরের কোন প্রিয়জনকে শুভ ভাবনার প্রকম্পন অনায়াসে পাঠাতে পারা যায় এবং তার মধ্যে থাকবে পবিত্রতা। যুবক-যুবতীরাই ঈশ্বরের নির্বাচিত সুগন্ধী ফুল। এর থেকে বড় প্রাপ্তি জীবনে আর কী হতে পারে? তারাই ঈশ্বরের কাছে পারে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে (Total Surrender), বলতে পারে "ভগবান, আমার যা আছে সবই তো তোমার"। সাংসারিক বৈভব থেকে আনন্দ পাওয়া যায় না। এটা পাবার জন্য উচ্চতম শক্তি ধারণ করতে হয়। পরমানন্দের উৎস পরমাত্মা। এই শক্তি পবিত্রতার বলেই অর্জন করতে পারা যায়।

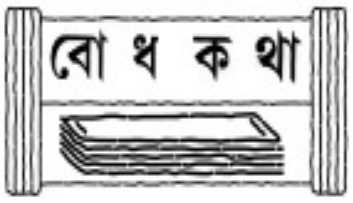

বোধকথা

সবার নবদা

১৯২৫ সালের ৫ জুন বাঁকুড়া জেলার রাধানগর (বিষ্ণুপুর) গ্রামে জন্ম। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু সংগঠনের মূলীভূত ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। প্রথমে ৪টি স্থানে অর্থাৎ বলরামপুর, রঘুনাথপুর, বেলডাঙ্গা এবং ওন্দায় সঙ্ঘের বিস্তারক হিসাবে কাজ করেন। তারপর হিন্দুত্ব ভাবনা বিকাশের কাজে তিনি নিজেকে নিবেদন করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬০ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে সমাজের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন।

১৭ বৎসরাধিক কাল প্রচারক হিসাবে কাজ করার পর তিনি শারীরিক কারণে ঘরে ফিরে আসনে। দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবসা, চাকরি বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু সঙ্ঘ-ভাবনা প্রতিনিয়তই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। খদ্দেরের সঙ্গে ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে বলতেন সঙ্ঘের কথা। পরিণাম যা হবার তাই হল। ব্যবসা গুটিয়ে গেল। তারপর একটা চাকরীতে যোগদান করেন।

কিন্তু এখানেও জমল না। প্রবীণ প্রচারক মনোমোহন রায়ের মাধ্যমে আবার ফিরে আসেন হিন্দু সংগঠনের

নবদা

কাজে। ১৯৯৬ সালে কল্যাণ আশ্রমের কাজে পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসাবে যোগদান করে জনজাতি ক্ষেত্রে হিন্দুত্ব ভাবনা বিকশিত করায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কেন্দ্র ছিল বীরভূম জেলার মল্লারপুর ছাত্রাবাস। অতিথি পরায়ণতা এবং আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অল্পকালের মধ্যে তিনি 'সবার নবদা' হয়ে ওঠেন। ছাত্র এবং কার্যকর্তাদের স্বাস্থ্যের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। দুঃখী, পীড়িত মানুষকে তাঁর শেষ সম্বলটুকু দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

২৯ বৎসর তিনি তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেননি। ক্ষেত্রীয় ছাত্রাবাস প্রমুখ মহীতোষ গোলের অধীর আগ্রহে দু'বছর পূর্বে তিনি তাঁর বাড়ী যান। পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধা বউদি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে নবা বলে বিশ্বাস করেন। তারপর একে একে সবার সঙ্গে পরিচয় হয়। গত ২৪শে অক্টোবর ২০০৯ বেলা ২টা ৩০ মিঃ এ কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা অকৃতদার নবকুমার পরামানিক অমৃতলোকে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। নবদা চলে গেলেন কিন্তু রেখে গেলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ সুহৃদ এবং সঙ্ঘপ্রেমী মানুষকে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন অভিজ্ঞ কার্যকর্তা হারালাম।

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

জীবনে বিজ্ঞান

হাসতে হাসতে রোগ তাড়ান

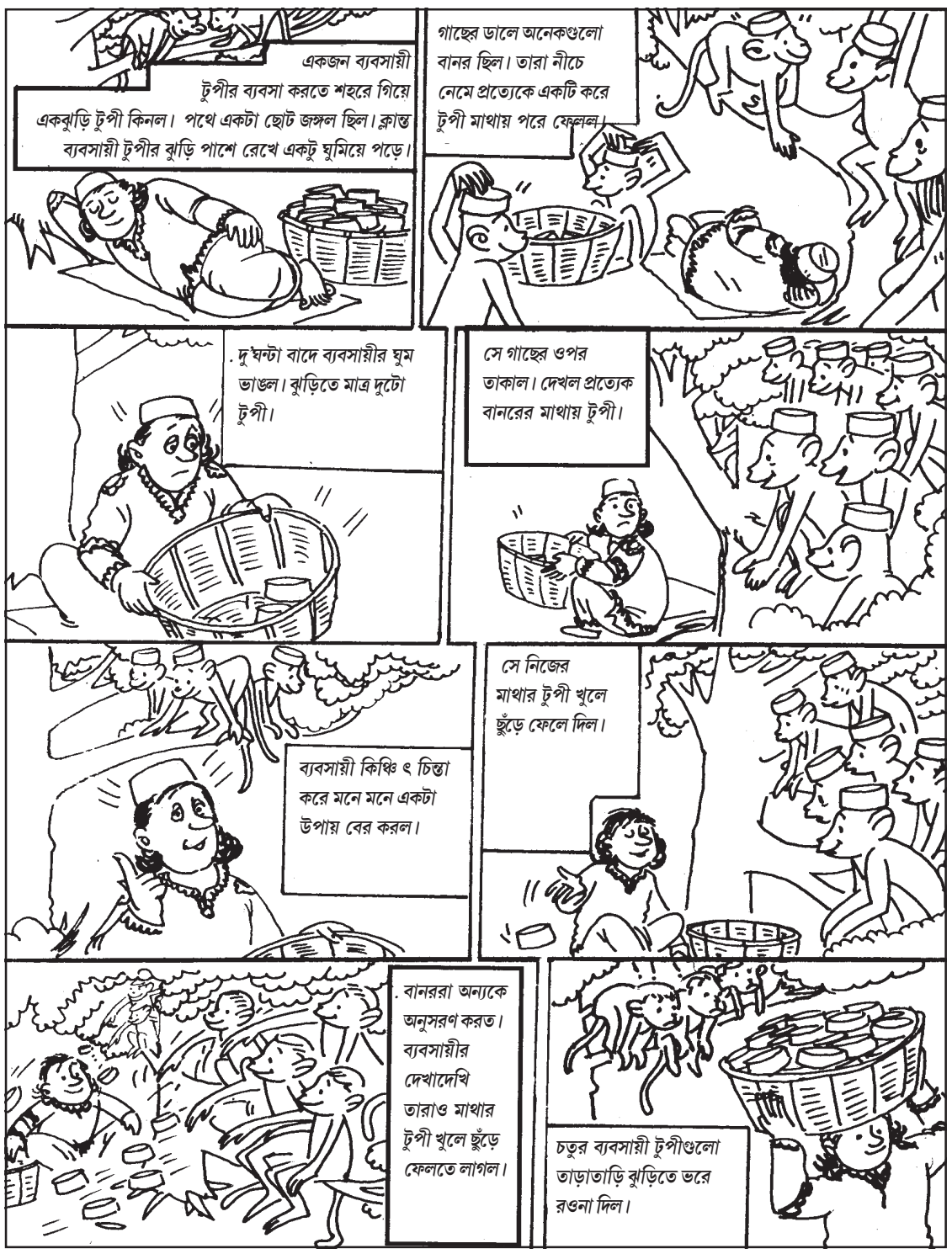

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, হৃদরোগকে দূরে রাখতে হাসির কোনও জুড়ি নেই। যাঁরা ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ এবং রক্তে কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের যদি ওষুধের সঙ্গে হাসির থেরাপি করা হয়, তবে তাঁদের রক্তে মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের মাত্রা কমে যায়। অন্য আর এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোনও হাসির সিনেমা দেখার পর হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীর জমাটভাব কমে গিয়ে অবাধে রক্ত চলাচল শুরু হয়। ফলে হার্ট-অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে। সুতরাং যাবতীয় চাপ থেকে রেহাই পেতে হলে নিত্যনতুন হাস্যরসে গা ভাসান।

পান থেকে পানীয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে তিন বছরের গবেষণার ফলে পান থেকে তৈরি ক্ষত্রত্নত্বদ্বদক্ষ নামে এক নরম পানীয় আবিষ্কার করেছে। রাজ্য পানচাষি সমিতির সহায়তায়। উৎপন্ন এই পানীয় খুবই স্বাস্থ্যসম্মত। কারণ, এতে রয়েছে পলিফেনল, যা হজমে সাহায্য করে, সর্দিকাশি নিরাময়ে ফলপ্রদ। পান থেকে তৈরি এই পানীয়কে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগার থেকে বাজারে নিয়ে এসেছে 'গাইড ফ্রুট অ্যান্ড বিভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড'।

মাড়িতে নতুন দাঁত

মাড়িতে ইঞ্জেকশন দেওয়া এবং দাঁত তোলার মতো যন্ত্রণার এবার অবসান হতে চলেছে। কারণ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে নতুন দাঁত গজাতে সক্ষম হয়েছেন। এই যুগান্তকারী গবেষণাটি করেছেন ওরিগন স্টেট্ ইউনিভার্সিটির ক্রুসা কিউইসি। ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে কিউইসি দেখেছেন, নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মাড়িতে আপনা থেকেই নতুন দাঁত গজাবে, আর পুরনো দাঁতটা পড়ে যাবে।

— নির্মল কর

রঙ্গকৌতুক

বাবা—বল্ দেখি, রাজা রামমোহন রায় কে ছিলেন?

ছেলে—এঁরা তিন বন্ধু ছিলেন—রাজা, রাম আর মোহন রায়।

*　　*　　*

বইবিক্রেতা—এই বইটা নিয়ে যান। পড়তে শুরু করলে হাসতে হাসতে মারা পড়বেন।

ক্রেতা—দিন তবে। আগে আমার স্বামীকে পড়তে দেব।

*　　*　　*

ভাবী শ্বশুর—তা বাবা, তোমার দাবী-দাওয়া কী?

পাত্র—তেমন কিছু না। তবে এমন একটা উপহার দেবেন, যা শুধু পেট্রলে চলে।

ভাবী শ্বশুর—ঠিক আছে, তোমাকে দামী একটা বিলিতি লাইটার দেব।

*　　*　　*

স্ত্রী—মুখ গোমড়া করে বসে আছ যে! কী হয়েছে?

স্বামী—আমার এড্‌স হয়েছে।

স্ত্রী—হোয়াট! কোত্থেকে বাধালে, দুশ্চরিত্র!

স্বামী—আঃ, তুমি যা ভাবছ তা নয়, এই এড্‌স হল অ্যাকিউট ইনকাম ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম—বিয়ের পর সব স্বামীরই হয়।

*　　*　　*

সহপাঠী (পরীক্ষার হলে)—এই রবি, 'বাট' এ ক'টা ব হবে রে, একটা না দুটো?

রবি—একটা দিলে হয়, তুই বরং দুটো ব দিয়ে দে, জোরদার হবে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় জিলিপির একটি বিশেষ নাম আছে। সেটা কী?

২। ভারতের কোন্ শহরকে উদীয়মান সূর্যের শহর বলা হয়?

৩। ষাটের দশকে সবচেয়ে জনপ্রিয় পপ্ গানের দলটির নাম কী?

৪। 'দাদার কীর্তি' চলচ্চিত্রটি কার গল্পের ভিত্তিতে নির্মিত?

৫। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করার সময় তিনটি রূপ ধারণ করেন। কী সেই তিনটি রূপ?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। কুণ্ডলিনী
২। উদয়পুর
৩। বিটলস
৪। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা

।। চিত্রকথা ।। ব্যবসায়ীর বুদ্ধি ।।

‘বন্দেমাতরম্’ ও মুসলমান সম্প্রদায়

অর্ণব নাগ

বন্দেমাতরম্-এর সৃষ্টিলগ্নে এর জন্মদাতা নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার এক ব্রাহ্মণসন্তান যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন যে তাঁর এই গানটি একদিন সমগ্র জাতিকে মাতিয়ে দেবে। তবে কিলিয়ে যে কাঁঠাল পাকানো যাবে না এই চিরাচরিত বিশ্বাসেও অবিচল ছিলেন তিনি। তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এটা না বললেও পাঠক এতক্ষণে দিব্যি বুঝে ফেলেছেন। ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যে হয় না—এমনই এক প্রবাদে বাঙালীর বরাবরের আস্থা। সুতরাং ঋষি বঙ্কিমের বাক্যও মিথ্যে হবার নয়। কিন্তু বিশ্বের জনপ্রিয়তম এই সঙ্গীতের সৌরভে সারা দেশ আমোদিত হলেও তাকে নিয়ে এতধরনের অনভিপ্রেত বিতর্ক ও রাজনৈতিক নোংরামি হয়ে গেছে—তা যে কোনও ভারতবাসীকে লজ্জিত করবে বইকি।

যে তালিকায় নবতম সংযোজন—একটি মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের তরফে দেওবন্দে বন্দেমাতরম্ নিয়ে ফতোয়া জারি। তাদের যুক্তি, ইসলামে মাতৃবন্দনার কোনও স্থান নেই। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ভাবাবেগকে হাতিয়ার করে রচিত এই গানটি ইসলাম বিরোধী। যাই হোক, যে কথা একেবারে গোড়াতেই বলা হচ্ছিল—যে বন্দেমাতরম্ নামক কাঁঠালটি একদিনে পাকেনি, সৃষ্টিলগ্নের প্রায় তিন দশক পরে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে উপলক্ষ করে আনন্দমঠে গীত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি স্বদেশী মন্ত্রের অভিধা গ্রহণ করেছিল। সেই সময় যার প্রবল সমর্থক ছিলেন মুসলিমরাও। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই ভোল পাল্টে গেল তাদের। বন্দেমাতরম্ হয়ে গেল হিন্দু সাম্প্রদায়িক। এই ভোল পাল্টানোর পুরো কৃতিত্বটা অবশ্যই দাবী করতে পারে একমাত্র মুসলিম লীগ। সেই ইতিহাসটুকু সর্বাগ্রে জেনে রাখা প্রয়োজন। নইলে ‘বন্দেমাতরম’কে নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণটা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

স্বদেশী মন্ত্র হিসেবে উদ্‌গাতা বন্দেমাতরমের উষালগ্নের দিকে প্রথমে নজর ফেরানো যাক। সন-১৯০৫, দিনাঙ্ক-৭ই আগষ্ট, স্থল—কলেজ স্কোয়ার, গন্তব্য—টাউন হল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে মহানগরীর রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে ‘আমরা শক্তি, আমরা বল-আমরা ছাত্রদল’। আচমকাই ওই মিছিল থেকে কোনও একজন চেঁচিয়ে উঠল

‘বন্দেমাতরম্’ বলে। তার সঙ্গে গলা মেলালো উপস্থিত সববাই। যদিও যে চেঁচালো তার নামটা পরের দিন কোনও খবরের কাগজেই বেরলো না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রটির দেওয়া ধ্বনিই আনন্দমঠে সীমাবদ্ধ ‘বন্দেমাতরম’-কে এনে দিল স্বদেশী আন্দোলনের পাদপ্রদীপের আলোয়। যদিও আলোর নিচের অন্ধকারটুকু তখনও ভালোভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল না। তবে ৮ই আগস্টের অমৃতবাজার পত্রিকা সাক্ষ্য দিচ্ছে—সেদিন স্কটিশ, প্রেসিডেন্সি, রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), বিদ্যাসাগর, সিটি ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররাও ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধরে নেওয়াই যায়, বন্দেমাতরম্ নামক স্লোগানে গলা মিলিয়েছিল তারাও। অমৃতবাজার পত্রিকার রেফারেন্স যখন টানাই হলো তখন সংবাদপত্র জগতে তার রাইভ্যাল ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় কি খবর বেরোচ্ছে তা দেখা যাক। ১৯০৫-এর ২রা সেপ্টেম্বর, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২৪শে সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিমদের যোগদানের একাধিক খবর ঘটা করে কাগজটিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বেশ কিছু মুসলিম নেতৃত্বের নাম পাওয়া যাচ্ছে যেমন আব্দুল রসুল, মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, আব্দুল হালিম গজনভী, মৌলবী লিয়াকত হোসেন, মৌলবী দেদার বক্স, ডাক্তার আব্দুল গফুর, মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন, মৌলবী আবুল হোসেন, মজিবুর রহমান প্রভৃতি। যাঁরা ওই স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এগুলি প্রদীপের সলতের প্রজ্জ্বলিত শিখা হলে তার অন্ধকারটি এখনই জেনে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ জাতীয় মন্ত্র হিসেবে ‘বন্দেমাতরম্’ নামক রাম জন্মানোর পূর্বেই তার বিরোধিতার রামায়ণখানি লেখা হয়ে গেছিল। এক্ষেত্রে বাল্মীকি অবশ্যই লর্ড কার্জন। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে ১৯০৪-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ সফরে ঢাকায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন—“এরকম একটা প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে যে ঢাকাকে কেন্দ্র করে এবং সম্ভাব্য রাজধানী হিসেবে ধরে নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসন গড়ে তোলা হবে। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা (বলা বাহুল্য তারা মুসলিম) এবং তাদের প্রবহমান সংস্কৃতিই এই নতুন তৈরি হওয়া অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করবে। ইতিপূর্বে মুসলমান ভাইসরয় এবং রাজাদের আমলে মুসলমানরা যে একাধিপত্য উপভোগ করতেন বর্তমান আমলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কাছে এই নতুন রাজ্যটি তার থেকেও বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠবে।” এই বক্তব্য শুনে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হলো নবাব সালিমুল্লার।

তবে প্রদীপের কিছু অংশ তখনও বাকি রয়ে গেছে। ব্রিটিশ সরকার কার্লাইল সার্কুলারের দ্বারা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান ও ‘বন্দেমাতরম্’ উচ্চারণ নিষিদ্ধ করলেন। ২৪শে অক্টোবর, ১৯০৫ সনে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে ফিল্ড অ্যান্ড অকাদেমীর মাঠে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সভাপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন এক মুসলিম। নাম আব্দুল রসুল। ওই সভা থেকেই জাতীয় বিদ্যালয়ের দাবীও তোলেন তিনি। ১৯০৫-এর ৭ই সেপ্টেম্বর সঞ্জীবনী পত্রিকায় এবং ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬-এ হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত ‘স্বদেশী’ ও ‘বয়কট’ সংক্রান্ত দুটি খবরেও মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের সংবাদ মিলছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত-অশিক্ষিত মুসলমানে তখন কোনও প্রভেদ নেই। বরিশালের ‘বিকাশ’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘জারী গানে দেশের কথা’ শীর্ষক একটি সংবাদ পরিবেশন করে। তাতে বলা হয়, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত এই জারী গান বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে রচিত হয়। তাতে মদত যোগান হিন্দু জমিদার মশাই বিরাজমোহন রায়চৌধুরী। এমনকী পুলিশ লাইনে কালীপুজো উপলক্ষে জারী গান ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সভাপতির ভাষণে ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন, ‘হিন্দুগণ অপেক্ষা এই আন্দোলনে মুসলমানদের উপকার হচ্ছে বেশি।’ পূর্ব বাংলার ফুলারী অত্যাচারের কাহিনী পরবর্তীতে জড়িয়ে যাবে এই প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে।

প্রদীপের বিস্তর সন্ধান করা হলো। চোখ-ফেরানো যাক তার নিচের অন্ধকারটির দিকে। ১৮৯৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করলেন সৈয়দ আহমেদ খাঁ। কিন্তু ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। আলিগড় আন্দোলনের ধারায় বারোটা বাজতে চলেছে দেশের। একা আলিগড়ে রক্ষে হলো না, সুগ্রীবের ন্যায় দোসর হিসেবে উদিত হলো মুসলিম লীগ। যার সম্বন্ধে লীগের প্রতিষ্ঠাবর্ষেই অর্থাৎ ১৯০৬ সালে চারুমিহির পত্রিকা বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। তবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সালিমুল্লা একতরফা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। এমনকী বঙ্গভঙ্গের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দিনটিকে (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৬) ‘শুভ দিন’ হিসেবে সম্বর্ধিত করতেও তার বাধেনি। আর মুসলিমের এই হিন্দু বিরোধিতায় অনুঘটকের কাজটি করেছিল ইংরেজরা। একদিকে মুসলিমদের কোলে ঝোল টেনে কার্জনের বক্তৃতা অন্যদিকে গভর্ণর ফুলারের ‘সুয়োরাণী’ মতবাদ মুসলিমদের করে তুলল ‘বন্দেমাতরম্’ বিদ্বেষী। আবার চিরোল প্রদত্ত ‘বন্দেমাতরম্’-এর ব্যাখ্যা ছিল—‘এটা নাকি ‘নেটিভদের কালী পুজোর উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হয়।’

যদিও এর মোক্ষম জবাবটি দিয়ে দিয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ। তিনি তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে এক পত্রে লেখেন, “অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলে জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পুজো করি।”

বন্দেমাতরম্ নিয়ে মুসলমানদের সমর্থনের প্রদীপের শিখাটি ছিল এইটুখানি, কিন্তু তার কালো ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হতে হতে গ্রাস করে নিয়েছিল ওই সমর্থনকারী মুসলমানদের। আর এই আলো-আঁধারির খেলায় হারিয়ে গেল মাতৃবন্দনার অধিকারটুকুও (নাকি কর্তব্য?)।

মঙ্গলনিধি

সঙ্ঘ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যয়ের কিছু অংশ সমাজ-সেবামূলক কাজে সমর্পণ করার যে ধারা গত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে তা ‘মঙ্গলনিধি’ নামে সুপরিচিত। সম্প্রতি দুটি অনুষ্ঠানে এই মঙ্গলনিধি সমর্পণ করলেন বর্ধমানের দীর্ঘদিনের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা ফণীভূষণ দে এবং বসিরহাটের শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ২৬ আগষ্ট ফণীভূষণ দে তার নাতনি সুলগ্না দে’র বিবাহ উপলক্ষ্যে নিজগৃহ ৩নং ভবানী ঠাকুর লেন, বর্ধমান-এ একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন। তিনি সঙেঘর বরিষ্ঠ প্রচারক শ্যামলাল বন্দোপাধ্যায়ের হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন। উল্লেখ, পাত্রপক্ষও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সঙেঘর কতিপয় স্থানীয় কার্যকর্তা এবং প্রচারক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮ অক্টোবর নাতনির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙেঘর উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগ প্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডলের হাতে মঙ্গলনিধি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জেলার অন্যান্য কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলনিধির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন বসিরহাট জেলা সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষ নাথ।

বর্ধমানে মঙ্গলনিধি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বসিরহাটে মঙ্গলনিধি প্রদান করছেন অভিভাবক স্বয়ং।

কালিদাস সংস্কৃত আকাদেমি'র সংস্কৃত নাট্য মহোৎসব

বিকাশ ভট্টাচার্য ঃ আমাদের ভারতীয় নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃত নাটক। প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার বিস্তারের কাল। পণ্ডিতদের মতে ঋক্‌বেদেই নাটকের মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। 'সরমা ও পণি', 'যম ও যমী', 'পুরুরবা ও ঊর্বশী' প্রভৃতি সংবাদ-সূক্ত বা গাঁথা পরবর্তীকালে নাটক রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরে বেদমন্ত্রের উচ্চারণও গীত-নাট্যাভিনয়ের প্রাক্‌প্রস্তুতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। (উদ্ধৃতি: অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী)।

ধর্মাশোকম্ নাটকে শুচিস্মিতা মিশ্র, সুকুমার পতি, অশোক মণ্ডল, হরিশঙ্কর দাস।

আমাদের নাট্যচর্চার, শুধু আমাদেরই বা বলি কেন, সারা পৃথিবীর নাট্য-শিক্ষার্থীদের কাছে ঐতিহ্যমণ্ডিত এক আকরগ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আবির্ভাবেরও পূর্বে দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে ভরত মুনি তাঁর বিখ্যাত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি রচনা করেন। যেখানে অতীতের প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চ রূপ, নেপথ্য বিধান, প্রয়োগ পদ্ধতি, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালিদাসের সময় (চতুর্থ শতাব্দী) থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাট্যকার জীবিত ছিলেন। ভাস, কালিদাস, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি---তাঁদের সময়ে তো বটেই, আজও সমাদৃত। দুঃখের বিষয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে আধুনিক কালে যথার্থ গুরুত্ব না দেওয়ায় এইসব মণি-মাণিক্য আমরা হারাতে বসেছি।

জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে, সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য, সারল্য ও সম্প্রেষণীয়তা সাধারণের মনে যাতে ঔৎসুক্য জাগায়, সংস্কৃতের প্রতি যাতে আরও মানুষ আকৃষ্ট হয় তারজন্য সারা ভারতে 'সংস্কৃত ভারতী'-র মতো যেমন বিশেষ বেসরকারী সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। এমনই একটি সংস্থা উজ্জয়িনীর মধ্যপ্রদেশ সংস্কৃতি পরিষদের কালিদাস সংস্কৃত আকাদেমী। সম্প্রতি (৪--৬ সেপ্টেম্বর, '০৯) ইন্দোরের ছত্রীবাগ বেঙ্কটেশ মন্দিরের সুরম্য প্রেক্ষাগৃহে এঁরা আয়োজন করেছিলেন সংস্কৃত নাট্য মহোৎসব। তত্ত্বাবধানে ছিল রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়), নয়াদিল্লী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক মিথিলাপ্রসাদ ত্রিপাঠি (নির্দেশক) জানান, গতবছরেও ইন্দোরেই সংস্কৃত নাট্য মহোৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃত সংস্থা অংশ নিয়েছিল। এ ছাড়াও প্রতিবছর ডাঃ শিবমঙ্গল সিংহ সুমন স্মৃতি বাল-নাট্য মহোৎসব আয়োজিত হয়, যাতে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী সংস্কৃত নাটকে অংশ নেয়।

প্রথম দিন ভূপাল পরিসরের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান মঞ্চ স্থ করে 'সীতাচ্ছায়ম্'। এটি ভবভূতি বিরচিত উত্তর-রামচরিতের তৃতীয় অঙ্কের ওপর আধারিত। নাটকের নির্দেশক ডঃ সুজ্ঞান কুমার মহান্তি অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে সীতার বিরহে কাতর মানবিক দিকটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটকের শৃঙ্গেরীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান-এর রাজীব গান্ধী পরিসর মহাকবি ভক্তিভদ্র বিরচিত নাটক 'আশ্চর্য চূড়ামণি' নিবেদন করে। এই নাটকে বনবাসের সময় মোহিনী বেশে শূর্পনখা লক্ষণকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে উপেক্ষিত হয় এবং তৎকারণে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুবধের করুণ কাহিনি

ধর্মাশোকম্ নাটকে হরিশঙ্কর দাস ও সহশিল্পীরা।

বর্ণিত হয়েছে। ডাঃ রাঘবেন্দ্র ভট্ট ও ডাঃ সূর্য নারায়ণ ভট্ট এই নাটকের যুগ্ম-নির্দেশক।

তৃতীয় দিনটিতে ছিল কলকাতার সুরভারতী সংস্কৃত ইস্টিটিউটের প্রযোজনা 'ধর্মাশোকম্'। নাটকের রচনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, সুরভারতী সংস্কৃত ইস্টিটিউট সংস্কৃত নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ভারতের নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে চায়। শুধু দেশেই নয়, এই সংস্থার আন্তর্জাতিক বিভাগ ওয়ার্ল্ড পীস্ মিশনের উদ্যোগে বিদেশেও ভারতের ঐতিহ্য পরম্পরা সংস্কৃত নাটকের মাধ্যমে প্রচার করে চলেছে। সুরভারতীর 'ধর্মাশোকম্' চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকের আত্মিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কাহিনি। নাটকে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তার প্রচারে এগিয়ে যাওয়ার কথা আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, শুচিস্মিতা মিশ্র, সুকুমার পতি, অশোক মণ্ডল, প্রবীর ঘোষ, ভুলু হালদার, রফিকুল হাসান, দীপ্তি ঘোষ, লীনা গাঙ্গুলী, গোবিন্দ বসাক ও অজিত আচার্য প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। সম্রাট অশোকের ভূমিকায় অভিনয় করেন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হরিশঙ্কর দাস।

রঙ্গম

শব্দরূপ - ৫২৬

নয়ন পাল

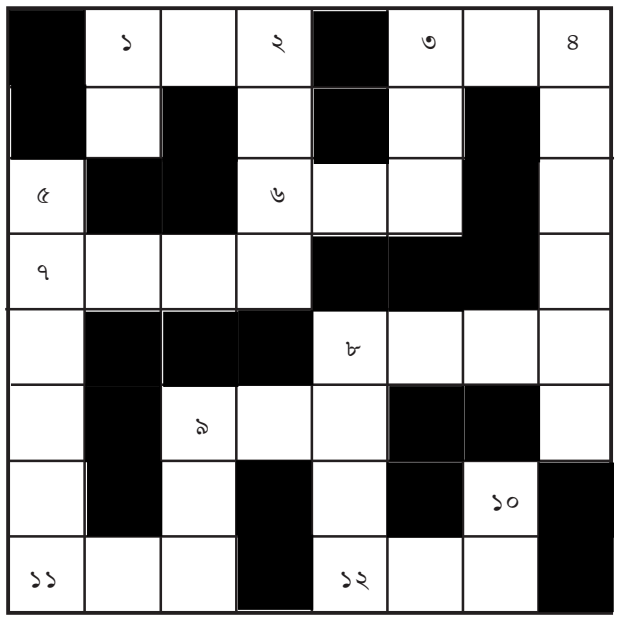

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শ্রীকৃষ্ণ এর অন্য নাম, বিশেষণে যদুবংশীয়, ৩. ধনদেবতা কুবেরের পুরী, গন্ধর্বদের বাসস্থান, ৬. বৃষ্টির দেবতা, ব্রহ্মা এঁকে সমস্ত জলবর্ষণের অধিপতি করেন, ৭. মনের ভাব, অভিপ্রায় ও চেষ্টা, একে তিনে আরাকানের অধিবাসী, শেষ দুয়ে বেগ, ৮. তৎসম শব্দে চাঁদের অংশ, শেষ দুয়ে কদলী, ৯. উমার স্বামী, ১১. হিন্দি শব্দে সুর ভাঁজা, গানের সুরের নানারকম কৌশল প্রদর্শন, ১২. মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী।

উপর-নীচ ঃ ১. তৎসম শব্দে যজ্ঞ, হোম, ২. কুবের, সূর্য, প্রথম দুয়ে গঙ্গার আটপুত্র, শেষ দুয়ে স্বামী, ৩. তৎসম শব্দে ভিন্ন ভিন্ন, অপরাপর, ৪. কৃষ্ণ ও বলরাম, ৫. বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বদিকের সমতলভূমি, হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান, ৮. অন্যনামে চাঁদ, দুয়ে-চারে বাণ, ৯. শ্রীকৃষ্ণের এক পরমভক্ত, উনি সত্যকের পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য, ১০. পাণ্ডবদের জননী।

এর উত্তর প্রকাশিত হবে ৭ই ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়।

ভারত বিকাশ পরিষদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

ভারত বিকাশ পরিষদ মধ্য কলকাতা শাখার উদ্যোগে গত ১২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ভাষা পরিষদ হল—এ অনুষ্ঠিত স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ভারত বিকাশ পরিষদের মধ্যকলকাতা শাখার সভাপতি তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি সুনীল সিংহানিয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি সন্তোষ সরাফ এবং সমাজসেবী পি এন শর্মা। মাহেশ্বরী গার্লস হাইস্কুল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশী হিন্দুদের দুর্দশা দেখেও স্বাধীন যুক্তবঙ্গের জন্য দীর্ঘশ্বাস কেন?

শিবাজী গুপ্ত

দেশভাগ-জিন্না-গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল নিয়ে সংবাদপত্রের বাজার এখন সরগরম। দেশভাগের জন্য বলির পাঁঠা গান্ধী আর বাংলা ভাগের জন্য নন্দ ঘোষ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। মাঝেমাঝেই এদের নিয়ে খবরের কাগজে প্রতিবেদন বা প্রসববেদন জাতীয় রচনা প্রকাশ হয়। তাই কিছুকাল আগে মার্কিন গবেষক স্ট্যানলি ওলপার্টের—"স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র চেয়েছিলেন জিন্না"—এই সংবাদ নতুন কোন আবিষ্কার নয়। বিস্ফোরক তো নয়-ই। এসব বহুকথিত বহুচর্চিত কথা। ওলপার্ট নতুন কিছুই বলেননি। তবে দেশভাগের পাপ থেকে জিন্নাকে মুক্ত করতে, তাঁর গা থেকে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধ দূর করতে পাকিস্তানের পশ্চিমী বন্ধুরা এবং ভারতীয় জিন্না-অনুরাগীরা মাঝে মাঝে এসব পুরনো কথা নতুন করে বলে চমক সৃষ্টি করে থাকেন। এরকম একটা চক্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় রয়েছে। জিন্নাকে 'মহাত্মা' বানাতে এদের চেষ্টার কসুর নেই। কিছুদিন আগে এদের জালে পড়ে প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি আদবানীজীও নাজেহাল হয়েছেন।

যে ব্যক্তি দ্বিজাতি-তত্ত্বের উদ্‌গাতা দেশভাগের প্রবক্তা এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্যোক্তা সে ব্যক্তি কি করে অসাম্প্রদায়িক হয়, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত হয়, সেকথা বোঝা দুষ্কর। যারা এসব ভাবালুতায় ভেসে যান, তারা ভুলে যান ১৯২০-এর পূর্ববর্তী জিন্না চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন ধরা পড়েছিল গান্ধীজীর দৃষ্টিতে ১৯৩৮ সালেই —পাকিস্তান প্রস্তাব তোলার দু'বছর আগে। জিন্নার সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট বোলচালে অবাক গান্ধীজী জিন্নাকে লিখেছিলেন ঃ

In your speeches I miss the old nationalist. When in 1915 I returned from the self imposed exile in South Africa, everybody spoke of you as one of the staunchest of nationalists and the hope of both Hindus and Muslims. Are you still the same Mr. Jinnah? If you say you are, in spite of your speeches, I shall accept your word" (3.2.1938).

বলাই বাহুল্য, জিন্নার কাছ থেকে এই জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর আসেনি গান্ধীজীর কাছে।

স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব জিন্না কখন তুললেন? যখন কলকাতার রাস্তা মানুষের রক্তে ভেসে গেছে এবং নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ধর্মান্তরিত হিন্দু ও ইজ্জতহারা-নারীর বোবা কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে মুসলমানদের দাবী মতো দেশভাগ হিন্দুদের দাবী মতো প্রদেশ ভাগ অবধারিত হয়ে উঠেছে, তখনই জিন্না-সুরাবর্দীদের টনক নড়েছে। তারা তো সমগ্র পাঞ্জাব এবং সিন্ধু-সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান নিয়ে পশ্চিমে ১নং পাকিস্তান; আবার সমগ্র বাংলা, আসাম ও তৎসহ ত্রিপুরা-মণিপুর-মিজোরাম-নাগাল্যাণ্ড - মেঘালয়-অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে পূর্বে ২নং পাকিস্তানের খোয়াবে মশগুল ছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখেরা এবং বাংলায় হিন্দু মহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সেই সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতেই পোকা-কাটা পাকিস্তানের চেহারা দেখে জিন্না-সুরাবর্দীরা ভেঙ্গে পড়লেন। তখন স্বাধীন যুক্ত-বঙ্গের ধুয়া তুললেন, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখালেন। ২৬ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে মাউন্ট-ব্যাটেনের জিন্নার সাক্ষাৎকার ঘটে। সরাসরি স্বাধীন বঙ্গ প্রসঙ্গ তুলে তাঁর মতামত জানতে চান—"I asked Mr. Jinnah straight out his views were about keeping Bengal united at the price of its remaining out of Pakistan."

> **"যুক্ত স্বাধীন বঙ্গের নামে সমগ্র বাংলাকে Subsidiarry Pakistan অর্থাৎ প্রকারান্তরে পুরো পাকিস্তান বানাবার অপকৌশল, তা ধরতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। মাউন্টব্যাটেনের কাছে লিখিত পত্রে (২ মে, ১৯৪৭) তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন, "Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan."**

যে জিন্না 'Surgical Operation', 'Divide and Quit' ছাড়া কথা বলেন না, কথায় কথায় পিস্তল বের করেন, তিনি বিনা দ্বিধায় বলে ফেললেন যে কলকাতা ছাড়া বাংলার কোনও মূল্য নেই; বাংলা অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমি নিশ্চিত তারা আমাদের সঙ্গে দোস্তসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখবে—"He said without any hesitation, I should be delighted. What is the use of Bengal without Calcutta; they had much better remain united and independent : I am sure that they would be on friendly terms with us".

দোস্তসুলভ সম্পর্ক বিষয়ে জিন্নার অবচেতন মনের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। স্বাধীনবঙ্গ মানে যে ''সহকারী পাকিস্তান'', জিন্না সেকথা বলে ফেলেছেন—

"Mr. Jinnah considered that with its Muslim majority, and independent Bengal would be a sort of *Subsidiary Pakistan* and was therefore, prepared to agree to Mr. Suharawardy–plan."

যুক্ত স্বাধীন বঙ্গের নামে সমগ্র বাংলাকে Subsidiarry Pakistan অর্থাৎ প্রকারান্তরে পুরো পাকিস্তান বানাবার অপকৌশল, তা ধরতে পেরেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। মাউন্টব্যাটেনের কাছে লিখিত পত্রে (২ মে, ১৯৪৭) তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন, "Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan." ১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতার বুকে 'নাদিরশাহী কাণ্ডের' পর (ফজলুল হকের ভাষায়) বাংলার হিন্দুরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কথা ভাবতেই পারে না।

সুতরাং স্বাধীন যুক্তবঙ্গ হয়নি বলে আফশোসের কিছু নেই। বাংলার যে দুই-তৃতীয়াংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়েছে, সেখানকার হিন্দুদের কি দশা হয়েছে, ভাবুন। পশ্চিমবঙ্গ ও সেই স্বাধীন বাংলার সঙ্গে সামিল হয়ে যুক্ত বাংলা গড়লে সমগ্র বাঙালী হিন্দু জাতির কি দশা ঘটত তা ভাবলেও আতঙ্ক হয়।

"যুক্তবঙ্গ কোনও অবস্থাতেই পাকিস্তানে যোগ দেবে না"—শ্যামাপ্রসাদের দাবী মতো এই ধারা যুক্তবঙ্গের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে সুরাবর্দী রাজী না হওয়াতেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। মার্কিন গবেষক ওলপার্টের এসব তথ্য জানা নেই বলেই তিনি মুসলিম নেতা ও সেকুলার বাহিনীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে যুক্তবঙ্গের জন্য আক্ষেপ করেছেন। তথাকথিত বাংলাদেশের বর্তমান রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক হাল দেখেও যারা স্বাধীন যুক্তবঙ্গে হিন্দুদের দুর্দশা দুর্ভোগ অনুমান করতে অপারগ, তাদের রাজ-নৈতিক শৈশবাবস্থা এখনো কাটেনি বলতে হবে।

ঘাটলাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কে জি বালাকৃষ্ণণের ঐতিহাসিক মন্তব্য

নামে কি আসে যায়? অপরাধীরা অপরাধীই'

''নামে কি এসে-যায়? অপরাধীরা অপরাধীই।'' বাটলা হাউস সংক্রান্ত একটি মামলা চলাকালীন সম্প্রতি এ মন্তব্য করেন দেশের প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণণ। প্রসঙ্গত, গত বছর নতুন দিল্লীর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণণ, বিচারপতি পি. সত্যশিবম্ এবং বি এস চৌহান-কে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টই সেইসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের

> **অপরাধীদের সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত করার দরকার নেই, কারণ অপরাধীরা অপরাধীই।**

কে জি বালাকৃষ্ণণ

বাটলা হাউস-এ পুলিশ রেড করে। প্রতি আক্রমণে নিহত হয় দুই জঙ্গি। মারা যান এক পুলিশ কর্মীও। ওই জঙ্গিদের সাধারণ মানুষ সাজিয়ে বাটলা হাউসের সামনে ধর্নায় বসে একপ্রস্থ নাটক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুলায়ম সিং যাদবের মতো রাজনীতির তাবড় নেতা-নেত্রীরা। তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট-ব্যাঙ্কের তাগিদ ভারতীয় রাজনীতিতে যে আদৌ কোনও সুখকর প্রভাব ফেলবে না তা এবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন দেশের উদ্দেশ্যে বলেছেন ''আপনারা ওই জঙ্গিদের সমর্থনে বলছেন যে তাঁরা নিরীহ সাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাই যদি হবে তবে তাঁদের হাতে অস্ত্র থাকবে কেন? এবং সেই পুলিশের লোকটিকেই বা মারল কারা?'' প্রধান বিচারপতির কথায়—''অপরাধীদের সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত করার দরকার নেই, কারণ অপরাধীরা অপরাধীই।'' প্রসঙ্গত, বাটলা-কাণ্ডের দু'দিন পরেই ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের ফোন যায় হ্যাডলির কাছে। এই হ্যাডলিকে সামনে রেখেই লস্কর জঙ্গিরা পাকিস্তানে বসে ভারতে হামলার ছক কষেছিল।

আসলে আদালতে এ এন এইচ এ ডি (অ্যাক্ট নাউ ফর হারমোনি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি)-এর করা একটি পিটিশানের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা চলাকালীন বাটলা কাণ্ডে আসামী পক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দাবী করেন—পুলিশ সেদিন যে এনকাউন্টার করেছিল তা হলো ভুয়ো এনকাউন্টার। ভূষণের বক্তব্য ছিল, পুলিশ নিরীহ মানুষকেই জঙ্গি বানিয়ে খুন করেছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ভূষণ কয়েকটা ছবি আদালতকে জমা দেন। যার একটিতে দেখা যাচ্ছে, একজন অপরাধীকে পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে। অপরজনের মাথায় চারটে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।

কিন্তু আদালতের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের কাছে অস্ত্র থাকা অসম্ভব। এবং এনকাউন্টার না হলে পুলিশ কর্মীর মৃত্যুও সম্ভব ছিল না। এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ তিন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চের বক্তব্য, ''আমাদের দেশে, হাজার হাজার পুলিশকর্মী এনকাউন্টারে মারা যান। তাঁদের মনোবল বাড়াতে এই ধরনের বিচারই কাম্য।'' প্রসঙ্গত, দিল্লী হাইকোর্টের এক অন্তর্বর্তী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবিষয়ে তদন্ত চালিয়ে দিল্লী পুলিশকে পুরোপুরি নির্দোষ বলে জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আসামী পক্ষের আইনজীবী ভূষণের যুক্তি হল, এমনও তো হতে পারে যে পুলিশ ছেলেটা (পড়ুন জঙ্গি)-র ওপর অত্যাচার করেছিল, আর তাই সেই ছেলেটা হয়তো পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়েছিল।

তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ভূষণ পাশে পেয়ে গিয়েছেন জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিকেও। তাঁরা ওই পিটিশানে দাবী করেন, বাটলা এনকাউন্টারে নিহত আতিফ আমিন এবং মহম্মদ সাজিদের মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

এই বক্তব্যকে 'কষ্টকল্পিত গল্প' বলে উড়িয়ে দিয়ে বিচারপতিরা বলেছেন, ''এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে তাতে জনগণের 'হ্যারাসমেন্ট' ছাড়া আর কিছুই হবে না।'' এখানে উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রী অর্জুন সিং তাঁর দপ্তরের পক্ষ থেকে এনিয়ে মামলা চালাবার কথাও বলেছিলেন।

Swastika
23 November - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

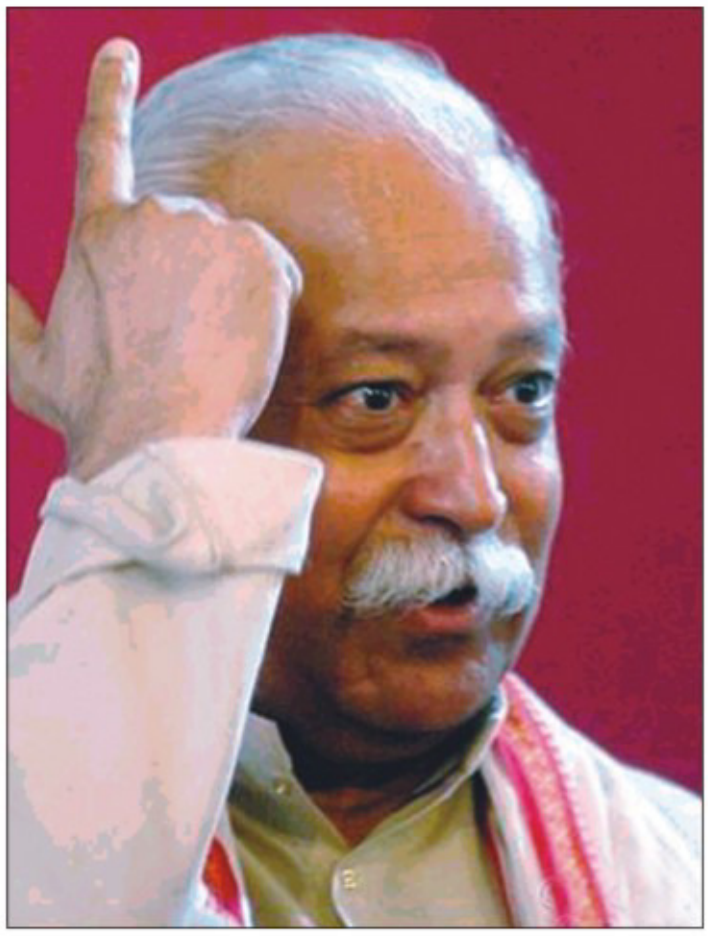

দেশের অখণ্ডতা নিয়ে কোনও আপস নয়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবতের সাক্ষাৎকার

(১ পাতার পর)

মোহনজী ঃ আমি বলব, এব্যাপারে সরকার হিন্দু সমাজের সেন্টিমেন্টকে পুরোপুরি উপেক্ষা করছেন। পুরো ব্যবস্থাটার ওপর একটা রাগ ওই ধাঁচাকে অপসৃত করেছিল।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু রামমন্দির, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি এবং সংবিধানের ৩৭০ ধারা নিয়ে আপনাদের দৃঢ় অবস্থান তো মুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে।

মোহনজী ঃ আমাকে খালি বলুন এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কথাবার্তা হচ্ছে না কেন? রামমন্দিরের ক্ষেত্রে নব্বই বছর ধরে আদালত কোনও রায় দিল না। এবং যখন এনিয়ে কিছুই হলো না, সর্বসাধারণ হিন্দুরা তাদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলল।

প্রশ্ন ঃ ভি পি সিং এনিয়ে একটি সমাধানসূত্র দিয়েছিলেন যে অযোধ্যায় মন্দির ও মসজিদ দুই-ই গড়ে তোলা হোক। একটা দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে আপনারা সেই উদারতা দেখালেন না কেন?

মোহনজী ঃ এই জিনিস একতা আনতে পারবে না। যদি রামমন্দিরকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে হিন্দু-মুসলমান লড়াই-এরও ইতি হবে। একই স্থানে একটা মসজিদ কখনও গঠন করা যাবে না। তারা অন্য কোনও স্থানে মসজিদ গড়ে তুলুক এবং হিন্দুরা তাদের যতটা সম্ভব সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ঃ শিখ বিরোধী দাঙ্গার জন্যে কংগ্রেস ক্ষমা চেয়েছে এবং আদবানী বলেছিলেন (বাবরি মসজিদ) গুঁড়িয়ে দেওয়া জাতীয় লজ্জা।

মোহনজী ঃ সঙ্ঘ কখনই বলেনি 'কাঠামো গুঁড়িয়ে দাও'। কিন্তু এনিয়ে চালু মামলার রায় দান করার ক্ষেত্রে আদালত অহেতুক বিলম্ব করায় মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আদবানীর সঙ্গে এবিষয়ে একমত হবেন যে এটা একটা জাতীয় লজ্জা?

মোহনজী ঃ আমি এই বিষয়ে আদবানীজির সাথে একমত নই। কেন তারা করসেবার জন্য আইনমাফিক অনুমতি দেয়নি যখন বিরাট সংখ্যায় করসেবকরা সেখানে একত্রিত হয়েছিল?

প্রশ্ন ঃ যাতে সংখ্যালঘুরা এদেশে নিরাপদ মনে করে, তেমন কিছু করতে সঙ্ঘ অনিচ্ছা প্রকাশ করল কেন? গুজরাতে যা ঘটেছে তা কিন্তু সঙ্ঘ এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যেকার ব্যবধানকেই প্রতিফলিত করেছে।

মোহনজী ঃ যে কারণেই হোক না কেন, হিংসার পথ সর্বদাই ভ্রান্ত। শুধু একদিকটা দেখবেন না। গোধরায় যা ঘটেছে তাও কখনই ঘটা উচিত নয়। কেউ কিন্তু গোধরার হত্যালীলার প্রসঙ্গ তুলছেন না।

প্রশ্ন ঃ গুজরাতের হিংসার জন্য কি নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমা চাওয়া উচিত?

মোহনজী ঃ তিনি একটি রাজ্যের প্রধান। সেখানে কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবগত এবং সেই সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া জানাতেও তিনি সমর্থ। যদি তিনি মনে করতেন যে ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু ঘটেছে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইতেন। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি একথাও বলব অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কিন্তু গুজরাতের দাঙ্গাকে আয়ত্ত্বের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। যদি তিনি কোনও ভুলই না করেন তবে ক্ষমা চাইতে যাবেন কেন? এটা কোনও পদ্ধতি হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ সোনিয়া গান্ধী এবং মনমোহন সিং-দু'জনে কেউই ১৯৮৪-এর দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত নন তবুও তাঁরা ক্ষমা চেয়েছেন। এটা তাঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। যদি মোদী বা আর এস এস এরকম কিছু করে তবে তো তারা লাভবান হতে পারে।

মোহনজী ঃ সেই সময় একটা কথা বলা হোত—'যখন কোনও বৃহৎ বৃক্ষের পতন হয়, তখন কয়েকটা ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে'। গুজরাতের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও মন্তব্য উঠে আসেনি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি এটাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আর এস এস তার কট্টরপন্থার বিষয়গুলো থেকে কোনদিন একচুলও সরবে না?

মোহনজী ঃ ভারতের একতা ও অখণ্ডতার সঙ্গে কোনও আপস নয়। সেই কারণেই অযোধ্যায় দরকার রামমন্দির এবং এক অভিন্ন দেওয়ানী আইন।

প্রশ্ন ঃ আমি যদি খুব একটা ভুল না করি তবে আপনি এখনও 'অখণ্ড ভারত' তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধী।

মোহনজী ঃ এগুলো সবই ভারতের অঙ্গ ছিল। পাকিস্তান স্বল্প স্থায়ী। আজ হোক বা কাল হোক পাকিস্তান ভারতবর্ষের অঙ্গ হবেই।

প্রশ্ন ঃ আফগানিস্তানের ব্যাপারে কি বলবেন?

মোহনজী ঃ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান উভয়েই আমাদের অংশ এবং তারা একদিন না একদিন ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি দাবী করেন যে আর এস এস বিজেপিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু আপনারা অনেক প্রচারককে বিজেপিতে পাঠিয়েছেন এবং তারা আপনার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখে।

মোহনজী ঃ তারা আমাদেরকে সবসময় সব খবরাখবর জানাবে এটা আবশ্যিক নয়। আমরা শুধু চাই যে তাঁরা তাঁদের নীতি-আদর্শে অটল থাকুন। আমরা তাঁদের কাজে নাক গলাই না।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আর এস এস বিজেপির ওপর চাপ সৃষ্টি করে বলে অনেক অভিযোগ আছে এবং আর এস এস এর এই চাপের কারণেই নাকি বসুন্ধরা রাজেকে সরে যেতে হয়েছে।

মোহনজী ঃ আর এস এস এনিয়ে কিছুই করেনি। এটা বিজেপির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ মাস চারেক আগে আপনি বিজেপির নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার কথা বলেছিলেন। বিগত তিনটে রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়েছে এবং পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

মোহনজী ঃ পরিবর্তন ঠিক তার সময়মতো হবে। আমি শুধু বলতে পারি আমি তখন বলেছিলাম (বিজেপির সৌজন্যে) তাদের এনিয়ে একটা পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেইমতো কাজ চলছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে একটা দৃঢ় ধারণা যে আপনারা বিজেপির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং নিজেদের কর্মসূচী বিজেপির ওপর চাপিয়ে দেন।

মোহনজী ঃ আর এস এস কখনও হস্তক্ষেপ করে না। যদি তারা কিছু জানতে চায় তখন স্রেফ পরামর্শটুকু দেয়।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনি বলেছেন এই চারজন (সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি, বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং অনন্তকুমার) বাদে অন্য কোনও নতুন নেতৃত্ব এগিয়ে আসবেন।

মোহনজী ঃ ঠিকই। ওই চারজন ছাড়া কোনও নতুন নেতৃত্ব এগিয়ে আসবেন আমি এটাই বলেছিলাম। যার সাথে তাঁরা একমত হয়েছিলেন এবং আমি বিশ্বাস করি সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি দিল্লীর বাইরে ৫০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী কাউকে আনতে চাইছেন?

মোহনজী ঃ তারাই দিল্লীর বাইরে থেকে কাউকে আনবে।

প্রশ্ন ঃ বিগত পাঁচ-ছ বছরে সংবাদ মাধ্যম বহু লোককে প্রচারের আলোয় এনেছে যাঁরা সঙ্ঘের অনুমোদিত নন কিন্তু বিজেপিতে এসে তাঁরাই মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এটাই কি আদর্শবাদকে কিছুটা লঘু করে দিয়েছে?

মোহনজী ঃ সঙ্ঘ কারুর বিপক্ষে নয়। আমরা কেউ স্বয়ংসেবক কিনা তাই দিয়ে তাঁর বিচার করি না।

প্রশ্ন ঃ বিজেপিতে যে সমস্ত স্বয়ংসেবকরা যোগদান করেছেন তাঁরা যে ক্রমশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন—এটা আপনাকে কতটা উদ্বেগে রাখে?

মোহনজী ঃ যদিও রাজনীতি একটি পিচ্ছিল জায়গা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও স্বয়ংসেবককে আমি পথভ্রষ্ট হতে দেখিনি। আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব বিজেপির।

প্রশ্ন ঃ বিজেপি সঙ্ঘ পরিবারের একটি দৃশ্যমান মুখ। যখন আপনি ওই দলটিতে কর্মীদের পাঠান তখন কি আপনি উদ্বিগ্ন হন? যে তাঁরা হয়তো নিজেরা এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব সংগঠনের উর্দ্ধে—এই ধারণায় প্রভাবিত হতে পারেন।

মোহনজী ঃ হ্যাঁ ঠিকই। আমরা এনিয়ে উদ্বিগ্ন হই এবং এনিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি এটা বেশি পছন্দ করবেন যে পার্টি এমন কারুর দ্বারা পরিচালিত হোক যিনি আর এস এসের আদর্শে বিশ্বাসী?

মোহনজী ঃ পার্টির পরিচালনা কারা করবেন না করবেন—সেটা তাঁরাই ঠিক করেন। আমরা তাঁকেই চাই যিনি আমাদের আদর্শকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন, টিমওয়ার্কে বিশ্বাসী হবেন, নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবেন ও অবশ্যই 'ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক দলে' একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হয়ে উঠবেন এবং যাঁর দর্শন (দেখা) সবাই পাবেন।

প্রশ্ন ঃ কয়েকটি প্রকাশ্য সংগঠন আছে যারা সঙ্ঘের অংশ নয়। তবুও তাদের আপনাদের মতোই একটা ধারণা রয়েছে যেটায় তাঁরা অবস্থান করছেন—যেমন ধরুন কর্ণাটকের শ্রীরাম সেনা..., প্রজ্ঞা ঠাকুর। আপনি কেন তাদের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক বিচ্ছেদ করছেন না?

মোহনজী ঃ আমি আগেই বলেছি যে শ্রীরাম সেনার বিষয়ে আমার কিছুই করণীয় নেই। হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বলে কিছু হয় না। কোনও হিন্দুই সন্ত্রাসকে সমর্থন করেন না।

প্রশ্ন ঃ তবুও আপনি প্রজ্ঞা ঠাকুরকে সমর্থন করছেন।

মোহনজী ঃ না, আমরা সবাই বলছি সংবাদমাধ্যমের কথা শুনে কিছু বলবেন না। আদালতের রায়ের জন্যে অপেক্ষা করুন।

প্রশ্ন ঃ আমি একটি সাম্প্রতিকতম বক্তব্যে দেখেছি যে আর এস এস বলেছে—পি চিদাম্বরম খুব ভাল কাজ করছেন।

মোহনজী ঃ তিনি একগুচ্ছ ভালো কথা বলেছেন। তিনি এগুলি কাজে পরিণত করলে আর এস এস অবশ্যই তাঁর প্রশংসা করবে।

প্রশ্ন ঃ আমরা কি চীনের ব্যাপারে কিছুটা নরম?

মোহনজী ঃ আমার সন্দেহ আছে যে সরকার চীনের ব্যাপারে আদৌ সতর্ক কিনা। ভারতকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা চীনের একটি সুপরিচিত কৌশল। মালদ্বীপ থেকে পাকিস্তান—আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাহায্য নিয়ে চীন চারদিক দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলছে। চীনের কবল থেকে আমাদের প্রতিবেশীদের মুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ চীন কি আমাদের কূটনীতি-তে হারিয়ে দিয়েছে?

মোহনজী ঃ হারায়নি। নাগাল টপকে কিছুটা এগিয়ে গেছে। আমরা এখনও অনেক কিছু করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানের ব্যাপারে বিজেপি-কে এখনও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে। এ নিয়ে আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গী কি?

মোহনজী ঃ ভারতবিরোধিতার তত্ত্ব থেকেই পাকিস্তানের অস্তিত্ব। তার সমস্ত ক্ষতিকারক পদক্ষেপের জন্য পাকিস্তানকে একটি জবরদস্ত প্রত্যাঘাত দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের দরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একটা সামরিক জয়। এটাই একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমরা ২৬/১১ ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী হামলা ঠেকাতে পারব।

প্রশ্ন ঃ আমরা কি একটা সামরিক জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছি?

মোহনজী ঃ হ্যাঁ। যখন প্রথমে সংসদ আক্রান্ত হলো এবং পরে ২৬/১১-এর মতো ঘটনা ঘটল। আমাদের সদিচ্ছার অভাব ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সহমত পোষণ করবেন যে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল পাকিস্তান ভারতের পক্ষে ভাল?

মোহনজী ঃ যদি পাকিস্তান মানসিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয় এবং ভারত-বিরোধী যাবতীয় মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করে তবেই সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়া টুডে' পত্রিকার সম্পাদক মোহনজীর সাক্ষাৎকার নেন। সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে হুবহু প্রকাশ করা হোল।

— সঃ স্বঃ

(ইণ্ডিয়া টুডে-র সৌজন্যে)

প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর '০৯
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ৩০ নভেম্বর '০৯
আগামী সংখ্যার আকর্ষণ
দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করছে মাওবাদীরা। বাস্তবে কমিউনিজম পৃথিবীতে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কমিউনিজম ফ্যাসিস্টেদেরই জন্ম দেয় – স্বস্তিকাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এরকম অনেক কথা বলেছেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। সঙ্গে থাকছে বইপাড়ার খবরা-খবর এবং সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকের মননশীল বিশ্লেষণ।
।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ব্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com